ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি

ষষ্ঠ শ্রেণি

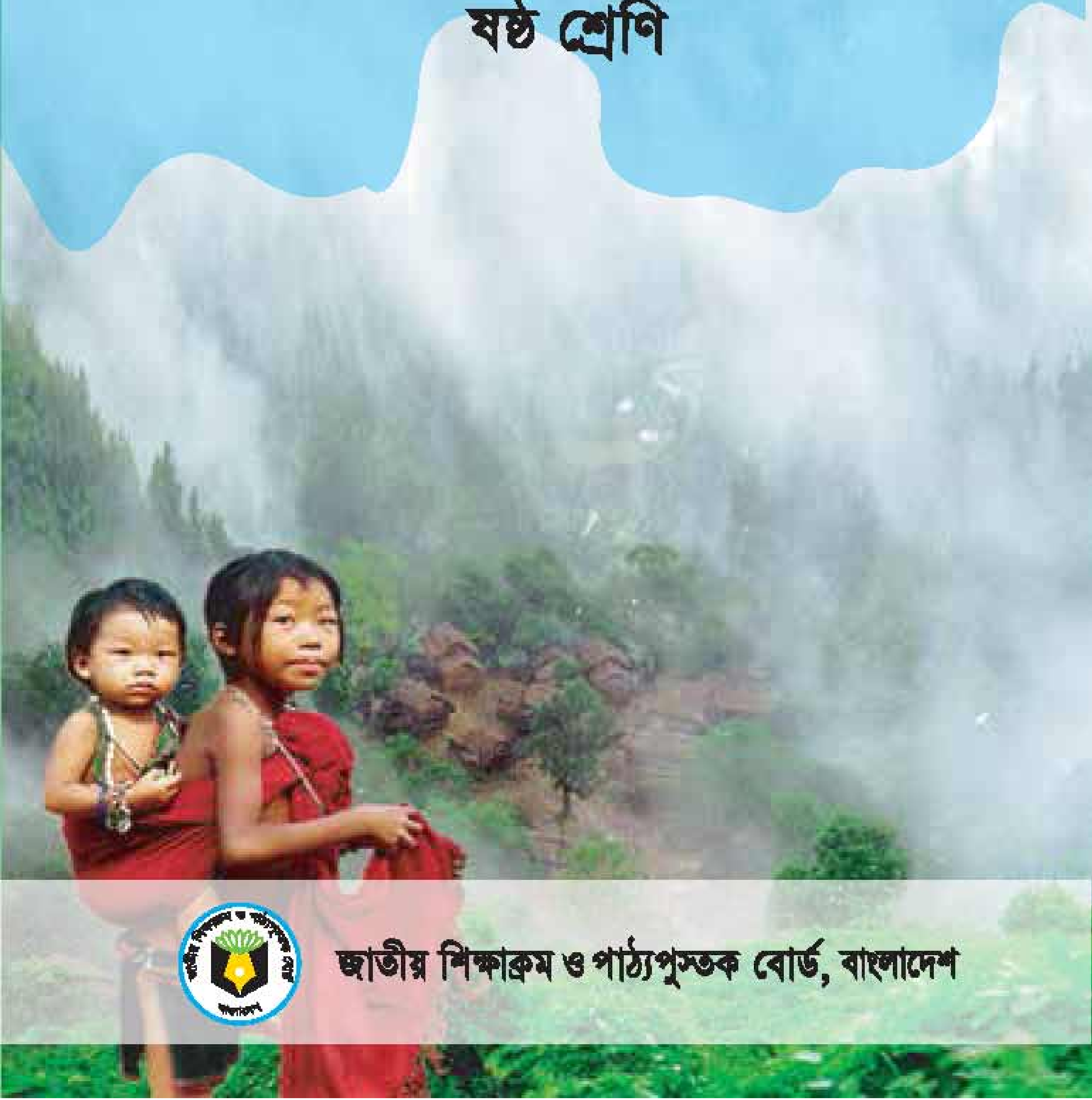

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি

ষষ্ঠ শ্রেণি

রচনা

অধ্যাপক ড. সৌরভ সিকদার
হাসান আল শাফী
স্বাগতম চাকমা

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মো. আহ্সান আলী
অধ্যাপক গণেশ সরেন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে ভিন্ন। জাতিতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি আমাদের গৌরব বহন করে। কিন্তু বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মানুষ আমাদের এ গৌরবময় সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে কমই জানে। এ বিষয়টির উপর লক্ষ্য রেখেই পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ২০১২-এর আলোকে প্রথমবারের মতো প্রণয়ন করা হয় **ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি** বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকটিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক নানা বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে। আশা করা যায়, শিক্ষার্থীরা এসব বিষয়বস্তু অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বিশেষ সংস্কৃতির অধিকারী জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচিতি	১— ১৩
দ্বিতীয়	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিচিতি	১৪— ৩১
তৃতীয়	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা পরিচয়	৩২— ৪০
চতুর্থ	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রত্নঐতিহ্য	৪১— ৫৭
পঞ্চম	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজ জীবন	৫৮— ৭৯
ষষ্ঠ	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসব	৮০— ৯২

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচিতি

সংস্কৃতি হলো আমাদের জীবনধারা। সংস্কৃতি আমাদের পরিচয়ও বহন করে। প্রকৃতিতে যেমন আমরা নানা বৈচিত্র্য দেখতে পাই, তেমনি সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও রয়েছে অসংখ্য বৈচিত্র্য। মানুষ ও তার সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করে নৃবিজ্ঞান। আমরা নৃবিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে জানতে পারব এই অধ্যায়ে। নিজের সংস্কৃতির পাশাপাশি অন্যের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার মাধ্যমে আমরা নিজেদের এবং আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করতে পারি। এই অধ্যায়ে আমাদের দেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী ও ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ ও তাদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাব।

চিত্র-১.১ : সাংস্কৃতিক জীবনধারা

এ অধ্যায়ের পাঠ শেষে আমরা–

- সংস্কৃতির ধারণাটি বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারব।
- বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ- ০১ : সংস্কৃতির প্রথম পাঠ

রাতুলের স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হলো ডিসেম্বরে। ছুটিতে সে তার মামার সাথে কানাডা বেড়াতে যায়। টরোন্টো শহরে তার মামার বাসা। তারা সবাই মিলে কানাডার অনেক জায়গায় বেড়াতে গেল। তখন শীতকাল। কানাডার শহর-গ্রামগুলো সবই সাদা বরফে ঢাকা। যতই দেখে ততই অবাক হতে থাকে রাতুল। কী অদ্ভুত সাদা বরফে ঢাকা এই দেশ কানাডা!

কানাডার মানুষগুলোও একেবারে অন্যরকম। টরোন্টো শহরে বিভিন্ন দেশের লোকজন বসবাস করে। তারা দেখতে যেমন আমাদের থেকে আলাদা, তেমনি তাদের কথাও কিছু বুঝতে পারে না রাতুল। এদের কেউ আফ্রিকান, কেউবা চীনদেশের, আবার অনেকে হয়ত ইউরোপীয় বা আমেরিকান। রাতুলের ভেবে খুব অবাক লাগে যে, একই দেশে কত জাতির মানুষ বসবাস করছে! যদি একটু আলাপ করা যেত ওদের সাথে, ভাবে রাতুল। এত শীতের মাঝে এরা কীভাবে থাকে, বরফের মাঝে কীভাবে চলাচল করে, এদের প্রিয় খাবার কী, অথবা কী ধরনের খেলাধুলা এদের পছন্দ ইত্যাদি নানা প্রশ্ন এসে উঁকি দেয় রাতুলের মনে। এদের ভাষা শিখতে পারলে কী মজাই না হতো, জানা যেত সবকিছু!

রাতুলের মামা সবাইকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন বাফীন দ্বীপে। এটি একেবারে উত্তর মেরুর কাছাকাছি অবস্থিত কানাডার সবচেয়ে বড় দ্বীপ। বছরের বেশিরভাগ সময় এখানে বরফে ঢাকা থাকে। আরও অবাক করা বিষয় হলো, শীতকালে এখানে সূর্য উঠে না। সে সময় দিনের পর দিন আর মাসের পর মাস, অন্ধকারে ঢাকা থাকে এ অঞ্চল। এ সময় আকাশে লাল, নীলসহ বিভিন্ন রঙের আলোর খেলা দেখা যায়। আবার একই জায়গায় গরমকালে সূর্য ডুবেই না। এমনকি, রাতদুপুরেও সূর্য দেখা যায়। কী অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য!

উত্তর মেরুর কাছাকাছি আর অন্ধকারে ডুবে থাকা এমন একটি ভুতুড়ে জায়গায় যে মানুষ বসবাস করতে পারে, আগে রাতুল তা কল্পনাও করেনি। বাফিন দ্বীপে ইনুইট নৃগোষ্ঠীর লোকেরা বসবাস করে। এরা এস্কিমো নামেও পরিচিত। ঐ অঞ্চলটি সারা বছর তুষারাবৃত থাকে বলে গাছপালা প্রায় নেই বলা যায়। এমনকি চাষাবাদও করা যায় না। ইনুইটরা তাই মূলত নানারকম মাছ এবং পশু শিকার করে বেঁচে থাকে। এই প্রচন্ড ঠান্ডায় বেঁচে থাকার জন্য কেরিবু নামে একটি প্রাণীর চামড়া দিয়ে তারা পোশাক তৈরি করে। ইনুইটদের চেহারা, ঘরবাড়ি, জামাকাপড়, চলাফেরা, ভাষা ইত্যাদি সবকিছুই একেবারে অন্যরকম। রাতুল আরও আশ্চর্য হয় ইনুইটদের বরফের তৈরি ঘর 'ইগলু' দেখে। মানুষ কীভাবে বরফের তৈরি ঘরে থাকতে পারে! রাতুল মনে মনে ভাবতে থাকে যে, তার বাংলাদেশের বন্ধুরা নিশ্চয়ই তার কথা বিশ্বাসই করতে চাইবে না!

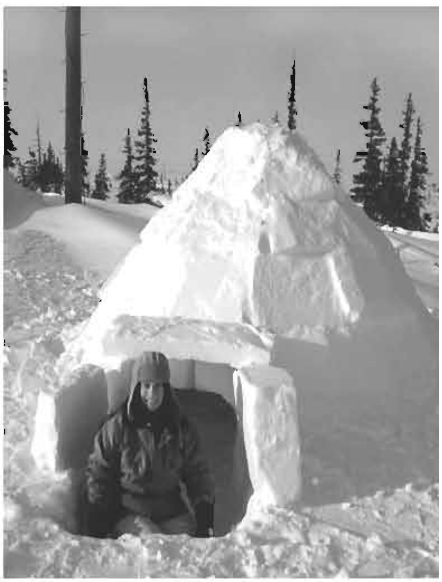

চিত্র- ১.২ : ইনুইটদের বরফের তৈরি ঘর 'ইগলু'

কানাডা যাত্রার পর থেকে আবার দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত রাতুল ছিল অচেনা আর অপরিচিত এক জগতে। সেখানে সে ছিল অনেকের মাঝে আলাদা। সেখানকার মানুষদের চিন্তাভাবনা, কাজকর্ম আর তাদের

২০২০

আচার-ব্যবহারের সাথে রাতুলের আগে পরিচয় ছিল না। তার চিরচেনা বাংলাদেশ থেকে এই নতুন জগত অনেক আলাদা। সেখানকার মানুষের চেহারা, ভূ-প্রকৃতি কিংবা আবহাওয়ার সাথে বাংলাদেশের রয়েছে অনেক পার্থক্য। দুই দেশের মানুষের আচার-আচরণ, আদব-কায়দা, চলাফেরা এবং কাজকর্মেও ব্যবধান অনেক। এই পার্থক্য আর বৈচিত্র্যের বিস্ময় রাতুলকে ভাবিয়ে তুলল। আমরা সবাই মানুষ, তারপরও কেন কানাডা ও বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এত পার্থক্য? বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী ও দেশের মানুষের জীবনযাত্রায় কিংবা ভাষায় এত তফাৎ কেন হয়? পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ও অঞ্চলের মানুষদের সাথেও কি আমাদের এত পার্থক্য?

রাতুলের কানাডা ভ্রমণে যে জিনিসটি তাকে অবাক করেছে তা হল সংস্কৃতির ভিন্নতা। কিন্তু যে বিষয়টি তাকে কৌতূহলী করেছে তা হলো হরেক রকম মানুষের নানা রকম বিশ্বাস, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ দেখার অভিজ্ঞতা। রাতুল তার অতি পরিচিত নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে কানাডার সংস্কৃতির পার্থক্যের বিভিন্ন দিক আবিষ্কার করেছে। সংস্কৃতির এ পার্থক্যগুলোই তাকে বিস্মিত করেছে। দেশবিদেশে ভ্রমণে গেলে সেখানকার অনেক কিছুই আমাদের কাছে একেবারে অজানা অচেনা মনে হয়, অবাক লাগে। সংস্কৃতির ভিন্নতার কারণেই এমনটি হয়। যেমন করে চারপাশের বায়ু আমাদের ঘিরে রাখে প্রতি মুহূর্ত আর বায়ুর অক্সিজেন আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, ঠিক সংস্কৃতিও তেমনি করে আমাদের ঘিরে রাখে সব সময়। আমাদের জীবনযাত্রার ধরনই হল আমাদের সংস্কৃতি।

প্রত্যেক জনগোষ্ঠীরই নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। আবার এক অঞ্চলের সংস্কৃতি থেকে অন্য অঞ্চলের সংস্কৃতি ভিন্ন হয়ে থাকে। সংস্কৃতি আমাদের শিখিয়ে দেয় কীভাবে কানাডার বরফে ঢাকা অঞ্চলে অথবা বাংলাদেশের সমভূমিতে বা নদীর পাড়ে বসবাস করতে হয়। পাহাড়ের উপরে কিংবা মরুভূমি অঞ্চলে কীভাবে ফসল ফলাতে হয় সেটিও সংস্কৃতি বলে দেয়। আমাদের চিন্তাভাবনা, রীতিনীতি ও ধ্যানধারণাকে লালন করে সংস্কৃতি। দৈনন্দিন জীবনে কখন কাকে আমাদের কী বলতে হবে, অথবা কখন কী করা উচিত- এর সবকিছুই সংস্কৃতি আমাদের শেখায় একেবারে ছোটবেলা থেকে। সমাজে চলাফেরার জন্য এবং সবাই মিলে একসাথে বসবাসের জন্য সংস্কৃতি আমাদের শেখায় রীতিনীতি, নিয়মকানুন, আদবকায়দা। তাই সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করেই আমরা সমাজের অন্যদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করতে পারি।

মানুষ ও তার সংস্কৃতি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে নৃবিজ্ঞান। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ও তাদের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির গঠন, উৎপত্তি, প্রবাহ, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা করে নৃবিজ্ঞান। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনাও নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। 'নৃ' শব্দের অর্থ হলো মানুষ। আর তাই নৃবিজ্ঞানকে মানববিজ্ঞানও বলা হয়ে থাকে। নৃবিজ্ঞানের প্রধান চারটি শাখা রয়েছে। এখানে নৃবিজ্ঞানের শাখাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হলো।

১.	সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান	:	বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতির বৈচিত্র্য নিয়ে অধ্যয়ন করে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান। মানুষের প্রতিদিনের কাজকর্ম, চিন্তা-ভাবনা ও আচার-আচরণ হলো সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।
২.	শারীরিক নৃবিজ্ঞান	:	বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের দৈহিক গঠন-বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করে শারীরিক নৃবিজ্ঞান। এজন্য প্রাচীন মানুষের ফসিল ও কঙ্কাল থেকে শুরু করে মানুষের

২০২০

			বংশগতি, ডি.এন.এ., খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টি, খুলির মাপ, আঙ্গুলের ছাপ ইত্যাদি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা করে শারীরিক নৃবিজ্ঞান।
৩.	ভাষার নৃবিজ্ঞান	:	ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের ভাষার উৎপত্তি, তুলনা, গড়ন ও কাঠামো ব্যাখ্যা করে ভাষার নৃবিজ্ঞান। ভাষা ব্যবহারের ধরন, বর্ণমালা, উচ্চারণের বৈচিত্র্য ইত্যাদি ভাষার নৃবিজ্ঞানের অধ্যয়নের বিষয়।
৪.	প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান	:	বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতির দৃশ্যমান উপাদানগুলোর অতীত ও বর্তমান অবস্থা নিয়ে গবেষণা করে প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান। মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা প্রাচীন নগরী থেকে শুরু করে অতীত ও বর্তমান মানুষের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বা নিদর্শন নিয়ে অধ্যয়ন করে প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	ছক একে সংস্কৃতি - বুঝিয়ে দাও।
কাজ- ২ :	নৃবিজ্ঞানের শাখা সমূহের তালিকা তৈরি কর।

পাঠ- ০২ : নৃবিজ্ঞানে সংস্কৃতির ধারণা

পৃথিবীর সকল মানুষেরই সংস্কৃতি আছে। সংস্কৃতি হলো মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস. শিল্পকলা, নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন, আদর্শ ও মূল্যবোধ, প্রথা ও রীতি, অভ্যাস ও আচরণ ইত্যাদির সমষ্টি। বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কাজ করতে হয়, খাদ্য উৎপাদন করতে হয়। শুধু উৎপাদন করলেই হয় না, তাকে সমাজের আইনকানুনও মেনে চলতে হয়। সমাজের নানা প্রথা, বিশ্বাস আর ধর্মও মেনে চলে মানুষ। মানুষের সংস্কৃতি শেখা শুরু হয় পরিবার থেকে। যেমন জন্মের পর সংস্কৃতি শেখার প্রথম পাঠ হলো আমাদের মাতৃভাষা। এরপর ধারাবাহিকভাবে আমরা সংস্কৃতি শিখতে শুরু করি পরিবার ও সমাজের অন্যান্য মানুষের কাছ থেকে। মানুষের সমগ্র জীবনব্যবস্থাই তার সংস্কৃতি। নৃবিজ্ঞানীদের মতে অনেকগুলো উপাদান মিলে সংস্কৃতি গড়ে উঠে, যেমন :

- **জ্ঞান :** সকল সংস্কৃতির মানুষই তাদের নিজস্ব জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। টিকে থাকার জন্য খাদ্যের উৎস, আহরণের উপায় ও প্রস্তুত করার উপায় এসব বিষয়ে সকল সংস্কৃতির মানুষের নিজস্ব জ্ঞান আছে। জ্ঞান ব্যবহার করে মানুষ আবাসস্থল নির্মাণ করে কিংবা তার চারপাশের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে জীবন ধারণ করে।

- **বিশ্বাস :** প্রত্যেক সংস্কৃতিতে মানুষের জন্ম, অস্তিত্ব, তার জগৎ ও মৃত্যুকে ঘিরে নানা রকম বিশ্বাস প্রচলিত আছে। এর সাথে যুক্ত হয় অন্যান্য ধারণা, যেমন : সৃষ্টিকর্তা, প্রাণীদের আত্মা, অতিপ্রাকৃত শক্তিসহ আরও অনেক কিছু। এ ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান আমাদের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

○ **আদর্শ ও নৈতিকতা :** প্রত্যেক মানুষেরই তার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নৈতিকতার মান থাকে, যা তাকে ন্যায়-অন্যায়ের বোধ দেয়। এই আদর্শ ও নৈতিকতা মানুষের বিভিন্ন আচরণকে প্রভাবিত করে।

○ **নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুন :** প্রত্যেক সংস্কৃতিই মানুষের সামাজিক জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন-কানুন তৈরি করে এবং তা প্রয়োগ করে।

○ **প্রথা ও রীতি :** সকল সংস্কৃতিরই নিজস্ব প্রথা, মূল্যবোধ ও রীতি রয়েছে। নিজ নিজ প্রথা এবং রীতি অনুযায়ী একেক সংস্কৃতির মানুষ একেকভাবে জীবনযাপন করে।

○ **সামর্থ্য ও দক্ষতা :** সামর্থ্য ও দক্ষতার ভিত্তিতে মানুষ অন্যান্য সকল প্রাণী থেকে আলাদা। যেমন, ভাষা ব্যবহারের সামর্থ্য মানুষের অনন্য গুণাবলির অন্যতম। আবার একটি সংস্কৃতিতে সবারই কিছু নির্দিষ্ট দক্ষতা আছে, যেমন : শিকার করার দক্ষতা, গাছ-গাছালি সংগ্রহ করার দক্ষতা, চাষাবাদ করার দক্ষতা অথবা বাসস্থান বানানোর দক্ষতা ইত্যাদি।

○ **সমাজ ব্যবস্থা :** মানুষ সামাজিক জীব। তাই সমাজবদ্ধ হয়ে আমরা বসবাস ও জীবনধারণ করি। বেঁচে থাকার জন্য মানুষ তার চারপাশের পরিবেশ ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতি থেকেই মানুষ খাদ্যসামগ্রী আহরণ করে। প্রকৃতি থেকেই আসে তার গৃহ নির্মাণের সকল সামগ্রী। আবার জামাকাপড় তৈরির কাঁচামালও পাওয়া যায় প্রকৃতিতেই। সংস্কৃতি আমাদের শেখায় কীভাবে প্রকৃতি থেকে দরকারী কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে হয়। যেমন ইনুইটরা বরফের ঘর তৈরি করতে শেখে। উদাহরণস্বরূপ আরও বলা যেতে পারে, প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত খাদ্যশস্য ও শাকসবজি রান্না করে আমাদের খাবারের উপযুক্ত করতে হয়। রান্না করার কৌশল আমরা সংস্কৃতি থেকে পাই। সেইসাথে খাদ্যশস্য ও শাকসবজি উৎপাদনের পদ্ধতিও শিখি সংস্কৃতি থেকে। সংস্কৃতির ভিন্নতার জন্যই একজন সাঁওতাল কিংবা মারমা নৃগোষ্ঠীর কৃষক ও বাঙালি কৃষকের চাষ করার পদ্ধতির মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। তাই প্রকৃতি ও মানুষের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে সংস্কৃতি।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	সংস্কৃতির উপাদানসমূহের তালিকা তৈরি কর।
কাজ- ২ :	পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সংস্কৃতি আমাদের কীভাবে সাহায্য করে?

পাঠ- ০৩ : সংস্কৃতির উপাদানসমূহ

সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান আমরা খালি চোখেই দেখতে পারি। আবার সংস্কৃতির অনেক উপাদানই আমরা দেখতে পাই না। যেমন, মানুষের তৈরি ঘরবাড়ি আমরা দেখতে পাই; কিন্তু ঘরবাড়ি তৈরির জ্ঞান

ও কৌশল দেখা যায় না। এদিক থেকে বিবেচনা করে সংস্কৃতির উপাদানসমূহকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (১) দৃশ্যমান উপাদানসমূহ এবং (২) অদৃশ্য উপাদানসমূহ। নিচের সারণিতে কিছু উদাহরণের মাধ্যমে সংস্কৃতির দু'ধরনের উপাদানকে ব্যাখ্যা করা হলো।

সংস্কৃতির দৃশ্যমান উপাদানসমূহ	সংস্কৃতির অদৃশ্য উপাদানসমূহ
বিভিন্ন ধরনের ঘরবাড়ি যেমন, স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, গীর্জা, মন্দির, অফিস, আদালত ইত্যাদি।	আমাদের সামগ্রিক জ্ঞান-ই হলো আমাদের সংস্কৃতি যা দেখা যায় না।
বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র যেমন, চেয়ার, টেবিল, আলমিরা, খাট ইত্যাদি।	মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু এগুলো আমাদের আচার-আচরণকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে।
বিভিন্ন ধরনের পোশাক যেমন, শার্ট, প্যান্ট, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, শাড়ি, জুতা ইত্যাদি।	ধর্মীয় বিশ্বাস ও নীতিবোধ।
বিভিন্ন ধরনের যানবাহন যেমন, গাড়ি, বাস, ট্রাক, ট্রেন, প্লেন ইত্যাদি।	ভাষা, ধ্বনি ও ব্যাকরণ।
বিভিন্ন ধরনের খাবার ও পানীয় যেমন, রুটি, শরবত কোকাকোলা, পেপসি, বিস্কিট, চকোলেট ইত্যাদি।	শিল্পকলা, সাহিত্য ও সঙ্গীতের মর্মার্থ।
চাষাবাদের বিভিন্ন উপকরণ যেমন, সার, কীটনাশক, ট্রাক্টর, সেচযন্ত্র, লাঙ্গল, জোয়াল, মই ইত্যাদি।	চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধিবৃত্তি, মেধা ও প্রতিভা।
বিভিন্ন ধরনের বইপত্র যেমন, স্কুলের পড়ার বই, গল্পের বই, কবিতার বই, পেপার, পত্রিকা ইত্যাদি।	আদর্শ ও মূল্যবোধ।
একইভাবে সংস্কৃতির আরও অনেক দৃশ্যমান উপাদান রয়েছে।	জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাও আমাদের সংস্কৃতির অদৃশ্য উপাদান।

মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনেই সংস্কৃতির দৃশ্যমান উপাদানগুলো সৃষ্টি করেছে। অনেক সময় শত শত বছর ধরেও এসব দৃশ্যমান ও বস্তুগত উপাদানগুলো টিকে থাকতে দেখা যায়। যেমন, আমরা জাদুঘরে গেলে এমন অনেক জিনিস দেখতে পাই, যেগুলো শত শত বছরের পুরনো। সেগুলো দেখে আমরা সে সময়ের মানুষ এবং তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি।

সংস্কৃতির দৃশ্যমান উপাদানসমূহের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির অদৃশ্য উপাদানসমূহ, যেমন : মানুষের ধ্যান-ধারণা, মনোভাব, মূল্যবোধ ও মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই সংস্কৃতি বলতে একদিকে যেমন বস্তুগত আবিষ্কারকে বোঝায়, তেমনি অন্যদিকে ঐ বস্তুগত আবিষ্কারের পিছনের ক্রিয়াশীল চিন্তা-ভাবনা, কৌশল বা জ্ঞানকেও বোঝায়। সংস্কৃতির এসব উপাদান কোনোভাবেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

চিত্র – ১.৩ : সংস্কৃতির হিমরাশি

এবার একটি উদাহরণের মাধ্যমে সংস্কৃতির উপাদানসমূহের সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করি। আমরা সবাই নিশ্চয়ই সমুদ্রে ভেসে থাকা বিশাল বিশাল বরফখণ্ডের কথা শুনেছি। এগুলোকে আইসবার্গ বা হিমরাশি বলে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি সমুদ্রে এসব হিমরাশি দেখা যায়। মজার বিষয় হল, হিমরাশিগুলোর শুধুমাত্র দশ ভাগের এক অংশ আমরা সমুদ্রের পানির উপরে দেখতে পাই। বাকি নয় অংশই থাকে পানির নীচে। তাই পানির উপর থেকে দেখে কোনোভাবেই বোঝা যায় না যে, হিমরাশিগুলোর আকার কতো বড়, আর সমুদ্রের কতো গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের সংস্কৃতিকে সমুদ্রে ভাসমান এ হিমরাশির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। হিমরাশির পানির উপরের দৃশ্যমান অংশের মতো আমাদের সংস্কৃতিরও অনেক উপাদান দৃশ্যমান রয়েছে। আবার হিমরাশির পানির নীচের অদৃশ্য অংশের মতো সংস্কৃতির অদৃশ্য উপাদানগুলো সব সময়ই আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে, এই অদৃশ্য উপাদানগুলোই আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকে। তাই দৃশ্যমান ও অদৃশ্য উপাদানসমূহ মিলিয়ে সমগ্র সংস্কৃতিকে আমরা একটা হিমরাশির সাথে তুলনা করতে পারি। পাশের চিত্রে সংস্কৃতির হিমরাশি এবং এর বিভিন্ন উপাদান দেখানো হলো।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	সংস্কৃতির দৃশ্যমান উপাদানের ৫টি উদাহরণ দাও।
কাজ- ২ :	সংস্কৃতির অদৃশ্য উপাদানের ৫টি উদাহরণ দাও।

পাঠ- ০৪ : সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রত্যেক সংস্কৃতিই অনন্য ও আলাদা। তথাপি বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে আমরা কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। এই সকল বৈশিষ্ট্য জানার মাধ্যমেই কেবল আমরা সংস্কৃতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারি। এখানে সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো :

১. সংস্কৃতি শিখতে হয় : মানুষ সংস্কৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। বরং সে জন্মের পর থেকে নিজের সংস্কৃতি বিষয়ে ক্রমাগত শিক্ষালাভ করে। মায়ের হাত ধরেই একটি শিশু সংস্কৃতির প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে। এরপর তার আশপাশের সব কিছু থেকে তার নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে জানে। ধীরে ধীরে সেই শিশু কথা বলতে শেখে তার মাতৃভাষায়। শিশুটি তার নিজ পরিবারের সদস্যদের অনুসরণ ও অনুকরণ করার মাধ্যমেই তার পূর্বপুরুষের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়। ধারাবাহিকভাবে এই শিক্ষা গ্রহণ চলতে থাকে আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, স্কুলকলেজ ও সমাজের অন্যদের কাছ থেকে।

২. সংস্কৃতি আমাদের সবার : একই সংস্কৃতির সদস্যরা সবাই এর অংশীদার। সংস্কৃতি মানুষ একা অর্জন করতে পারে না। একই সংস্কৃতির সদস্যদের মাঝে বিনিময় ও আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে সেই সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, অর্থবহ হয় ও পূর্ণতা পায়। যেমন, বাংলা ভাষার জ্ঞান বাঙালি সংস্কৃতির সবার মাঝেই ছড়ানো আছে। বিশেষক্ষেত্র ব্যতিত একজন ভিনদেশি মানুষ বাংলা কথা বুঝতে পারবে না এবং বাংলা লেখাও পড়তে পারবে না। আবার আমাদের দেশেই বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর আলাদা মাতৃভাষা আছে। এক নৃগোষ্ঠীর মানুষ অন্য নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা অনেক সময়ই বুঝতে বা বলতে পারে না। যেমন, একজন বাঙালি সাঁওতালী ভাষা বুঝতে বা বলতে পারে না।

৩. সংস্কৃতি প্রবাহিত হয় : সংস্কৃতির উপাদানগুলো প্রধানত ভাষা, আচরণ, বিশ্বাস, ধর্ম প্রভৃতি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রবাহিত হয় আদান-প্রদানের মাধ্যমে। বাবা-মা তাদের সন্তানদের সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় শেখায় এবং তারাও তাদের সন্তানদের শেখায়। আর এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সংস্কৃতি সঞ্চারিত হয়।

৪. সংস্কৃতি অখন্ড যা বিচ্ছিন্ন করা যায় না : সংস্কৃতির উপাদানগুলো পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। যেমন, সংস্কৃতির উপাদান সংগীত, শিল্পকলা, ভাষা, সাহিত্য, বিশ্বাস, রীতি-নীতি ইত্যাদির একটিকে অন্যগুলোর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। একটি সংস্কৃতিকে অর্থবহ করতে এর প্রত্যেকটি উপাদানই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেকোনো একটি উপাদানের পরিবর্তন অন্য উপাদানগুলোকেও প্রভাবিত করে। তাই প্রত্যেকটি উপাদান নিয়েই সামগ্রিকভাবে মানুষের সংস্কৃতি গড়ে উঠে ।

৫. সময়ের সাথে সংস্কৃতির পরিবর্তন হয় : পারস্পরিক আদান-প্রদান, নিত্য নতুন উদ্ভাবন কিংবা স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির ক্রমাগত পরিবর্তন হয়। যেমন, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের সাথে সাথে সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়। টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি আমাদের জীবনযাত্রায় অনেক পরিবর্তন এনেছে।

	অনুশীলন
কাজ- ১ :	সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

পাঠ- ০৫ : সংস্কৃতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা

সংস্কৃতি হল আমাদের প্রাণ ও আমাদের পরিচয়। প্রকৃতিতে যেমন আমরা সীমাহীন বৈচিত্র্য দেখতে পাই, তেমনি মানুষের সংস্কৃতিতেও আমরা দেখি অশেষ বৈচিত্র্য। সংস্কৃতির এই বৈচিত্র্য বৃহত্তর অর্থে আমাদের জীবন ও পৃথিবীকে বর্ণময় ও আনন্দময় করে তোলে।

২০২০

আমাদের বোধ, বুদ্ধি, বিবেক, বিবেচনা, চেতনা ইত্যাদি সবই সংস্কৃতির মাধ্যমে গড়ে ওঠে। তাই আমাদের নিজেকে জানতে সংস্কৃতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নিজের সংস্কৃতিকে বোঝার পাশাপাশি অন্যদের সংস্কৃতি সম্পর্কেও আমাদের জানতে হবে। কেননা, এতে নিজেকে যেমন আরও ভালভাবে জানা যায়, তেমনি অন্যদের সাথে দূরত্ব কমিয়ে নতুন নতুন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের পারস্পরিক ভুল ধারণা, সন্দেহ, বিরোধ, নিছক ভয় ও অজ্ঞতা দূর করে মানবকল্যাণে ও উন্নয়নে সবাই মিলে একসাথে কাজ করা যায়। মানুষে মানুষে বিভেদ কমিয়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

সংস্কৃতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিচে উল্লেখ করা হলো–

- আয়নায় যেমন নিজের চেহারার প্রতিফলন দেখা যায়, তেমনি অন্য সংস্কৃতির দৃষ্টিতে ও তুলনায় নিজের সংস্কৃতিকে আরও ভালোভাবে দেখা, চেনা ও জানা যায়। এভাবে নিজ সংস্কৃতির অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করে নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা যায়।

- বিভিন্ন সংস্কৃতি থেকে শিক্ষালাভ করে নিজেদের সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করা যায়। মানুষের আচরণের সৃজনশীলতা, বৈচিত্র্য প্রভৃতি অনুধাবনের জন্য সংস্কৃতি পাঠ প্রয়োজন। এক সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও আবিষ্কার অন্য সংস্কৃতির মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে ব্যবহার করা যায়।

- বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি অধ্যয়ন করে সেই নৃগোষ্ঠীকে বিশ্বের অগণিত মানুষের কাছে পরিচিত করে তোলা সম্ভব। তাদের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সকলকে অবগত করা যায়।

- বিভিন্ন দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশে সফলভাবে উন্নয়ন করতে হলে ঐ দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। কোনো সমাজ বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা থাকলে তাদের উন্নয়নের প্রয়োজনীয় দিক ও কৌশলসমূহ যথাযথভাবে নির্ধারণ ও প্রয়োগ করা যায়।

- বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতির মানুষ পরস্পরের কাছাকাছি আসছে। তারা যেন পরস্পর খাপ খাইয়ে ও মিলেমিশে থাকতে পারে তার জন্য সংস্কৃতি অধ্যয়ন গুরুত্বপূর্ণ।

- একইভাবে পৃথিবীতে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংস্কৃতির উপাদানগুলো দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে আদানপ্রদানের ফলে অনেক ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনগুলো বোঝার জন্য সংস্কৃতি অধ্যয়ন গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলন

কাজ- ১ :	নিজের সংস্কৃতিকে বোঝার পাশাপাশি অন্যদের সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের কেন জানতে হবে?

পাঠ- ০৬ : সংস্কৃতি অধ্যয়নে আমাদের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি

সংস্কৃতির বৈচিত্র্য মানব সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সম্পদ। বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলন এবং পারস্পরিক শিক্ষাগ্রহণ ও আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে আজকের সভ্যতা। এক সংস্কৃতির আবিষ্কৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বুকে। যেমন, লোহার ব্যবহার সর্বপ্রথম শুরু হয়

তুরস্কে এবং তারপর তা পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে করা হয়। এভাবে আদান-প্রদানের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে সংস্কৃতি আর উপকৃত হয়েছে মানুষ। পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া কোনো মানুষ যেমন একা টিকতে পারে না, তেমনি একটি সংস্কৃতিও একক প্রচেষ্টায় উন্নতি লাভ করতে পারে না। তাই একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সকল সংস্কৃতির মানুষের মিলিত প্রচেষ্টা। শুধুমাত্র সকল সংস্কৃতির মানুষের মাঝে মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক ও সম্প্রীতির ভিত্তিতেই গড়ে উঠে একটি সুন্দর সামাজিক পরিবেশ।

সকল সংস্কৃতিই জ্ঞান আহরণের এক একটি অনন্য উৎস। আর তাই জ্ঞানের আধার হিসাবে যেকোনো সংস্কৃতির মর্যাদাই সমান। ছোট সংস্কৃতি আর বড় সংস্কৃতি বলে কিছু নেই। যেমন, আমাদের দেশে প্রায় দু' হাজার খুমি আর ১৪ কোটিরও বেশি বাঙালি বসবাস করে। এ ক্ষেত্রে জনসংখ্যার বিবেচনায় বাঙালিদের তুলনায় খুমিদের অবস্থান অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও সাংস্কৃতিক মর্যাদায় খুমি ও বাঙালিরা সমান। কেননা দুইটি সংস্কৃতিরই আলাদা কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ও স্বতন্ত্র ভাষা, সংগীত, শিল্পকলা, বিশ্বাস, রীতি-নীতি ইত্যাদি উপাদান রয়েছে। তাই আমাদের সবারই পরস্পরের প্রতি এবং অন্যান্য সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন।

প্রায়শঃ আমরা নিজের সংস্কৃতির তুলনায় অন্য সংস্কৃতিকে বিচার করার চেষ্টা করি। কিংবা হয়ত নিজস্ব মূল্যবোধের আলোকে ভিন্ন সংস্কৃতির কর্মকান্ড পরিমাপ করি। কেননা শৈশব থেকেই আমাদের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি লালনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু আমাদের এটা বুঝতে হবে যে, আমাদের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানের সাথে মিলে গঠিত হয়। সুতরাং আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির আলোকে অন্য সংস্কৃতিকে বিবেচনা করা সমীচীন নয়। কারণ, প্রত্যেক সংস্কৃতিই তার নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে অনন্য ও স্বতন্ত্র। তাই যেকোনো সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সঠিকভাবে বোঝার জন্য আমাদের সে সংস্কৃতির নিজস্ব মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা থাকতে হবে। নৃবিজ্ঞানীরা বলেন, প্রত্যেক সংস্কৃতিকে আলাদাভাবে এবং সে সংস্কৃতির সমস্ত দিক বিবেচনা করে বুঝতে হয়। একটি সংস্কৃতির মূল্যবোধ দিয়ে অন্য সংস্কৃতিকে মূল্যায়ন করা যায় না।

কাউকে দাঁতে কালো রং করতে শুনেছ কখনও? তুমি যদি ম্রো নৃগোষ্ঠীর সদস্য হও, শুধু তাহলেই বুঝবে কালো দাঁত কতোটা সুন্দর। অর্থাৎ আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের ম্রো সংস্কৃতিতে সুন্দর দাঁত বলতে বুঝায় কালো রঙের দাঁত। কাঁচা বাঁশের রস দিয়ে ম্রো ছেলেমেয়েরা দাঁতের রং কালো করে। যার দাঁত যত কালো সে তত সুন্দর একজন ম্রো মানুষের দৃষ্টিতে। শুধু তাই নয়, অবিবাহিত ম্রো ছেলেরা বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করে। ছেলেরা ঠোঁটে রং দেয়া থেকে শুরু করে চুল বেঁধে, খোঁপা করে সাজগোজ করে। ম্রো সংস্কৃতিতে এটাই ছেলেদের সৌন্দর্য বলে বিবেচিত। সুতরাং, ম্রো নৃগোষ্ঠীর সদস্য ছাড়া অন্য সংস্কৃতির কারও পক্ষে ম্রো ছেলেদের সৌন্দর্য মূল্যায়ন করা খুবই কঠিন। এই সৌন্দর্য বোঝার জন্য প্রথমে ম্রো সংস্কৃতিতে সুন্দর বলতে কী বোঝায়, সেটা আগে বুঝে নিতে হবে।

আবার দেখা যায়, সাঁওতাল সংস্কৃতিতে শুধু পুরুষরা এবং মান্দি বা গারোদের মাঝে শুধু নারীরাই সম্পত্তির মালিক হয়। মান্দি বা গারোদের নিয়ম অনুযায়ী, ছেলেরা বিয়ের পর তাদের নিজেদের বাড়ি ছেড়ে কনের বাড়িতে বসবাস শুরু করে। তাই মান্দি বা গারো সংস্কৃতিতে শুধু মেয়েরাই তাদের মা'র সম্পত্তির

মালিক হয়। শুধু তাই নয়, বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতা তাদের সবচেয়ে ছোট মেয়ের সাথে বসবাস করে বলে ছোট মেয়েরা তার মায়ের বসতবাড়ির ও জমির মালিক হয়। অন্যদিকে, সাঁওতাল সংস্কৃতিতে মেয়েদের সম্পত্তিতে কোনো মালিকানা থাকে না। সুতরাং, সাঁওতাল ও মান্দি (গারো) সংস্কৃতি দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে সম্পত্তির মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের নিজ নিজ সংস্কৃতির সাথে যদি এ দুটি পদ্ধতির ভিন্নতাও থাকে তারপরও গুরুত্ব ও মর্যাদার বিবেচনায় সব কয়টিই সমান মর্যাদার এবং গুরুত্বপূর্ণ। এখানে, কেউ কারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, যেকোনো সাংস্কৃতিক নিয়মনীতিই সেই সংস্কৃতির জন্য উপযোগী, কার্যকর এবং ভালো।

চিত্র -১.৪ : বান্দরবানের ম্রো পুরুষ

অনুশীলন

কাজ- ১ : অন্যের সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে কেন?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. মানববিজ্ঞান বলা হয় কোন বিজ্ঞানকে?

ক. সমাজ বিজ্ঞান খ. মনোবিজ্ঞান

গ. নৃবিজ্ঞান ঘ. প্রাণিবিজ্ঞান

২। সংস্কৃতির প্রথম পাঠ কী?

ক. মাতৃভাষা খ. সংগীত

গ. ধর্ম ঘ. প্রথা

৩। মাতৃভাষা একজন মানুষের-

i. জীবনযাত্রার স্বরূপ নির্ধারণ করে

ii. ভাবের আদানপ্রদানের সুবিধা দেয়

iii. সাংস্কৃতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i. ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

চিত্র দেখে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও-

৪ । মানচিত্রে A নির্দেশিত স্থানে কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বসবাস করে?

ক. ম্রো খ. খ্যাং

গ. মান্দি ঘ. খুমি

৫ । মানচিত্রে 'A' প্রদর্শিত স্থানে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

i. মেয়েরা মায়ের সম্পত্তির মালিক হয়

ii. ছেলেরা ঘরজামাই হয়

iii. ছেলেরা ঠোঁটে রং লাগায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i. ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০২০

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. রীতা বান্দরবান বেড়াতে গিয়ে ম্রো ও মারমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকদের দেখে উৎফুল্ল হয়। সে তার বাবাকে বলে, একই দেশে বসবাস করেও তাদের সাথে আমাদের কত পার্থক্য। তাদের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, আচার-আচরণে বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে। রীতার বাবা আমজাদ সাহেব বললেন, সংস্কৃতির এই বৈচিত্র্য পৃথিবীকে বর্ণময় ও আনন্দময় করে তোলে।

ক. নৃবিজ্ঞান কী নিয়ে আলোচনা করে? ১

খ. বাফীন দ্বীপের পরিচিতি বর্ণনা কর। ২

গ. বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে রীতার দেখা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের অবস্থান চিহ্নিত কর। ৩

ঘ, রীতার বাবার বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

২.

A	B
ভাষা	স্কুল
আদর্শ	চেয়ার
জ্ঞান	গাড়ি

ছক : সংস্কৃতির উপাদান

ক. জয়ন্তিয়া পাহাড় কোথায় অবস্থিত? ১

খ. "সংস্কৃতি প্রবাহিত হয়"- কথাটির তাৎপর্য বর্ণনা কর। ২

গ. 'A' অংশটি সংস্কৃতির কোন উপাদানকে নির্দেশ করছে- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'B' অংশের উপাদানই সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে' উক্তিটি কি তুমি সমর্থন কর?- মতামত দাও। ৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিচিতি

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। আপাতদৃষ্টিতে মূলত বাঙালি অধ্যুষিত মনে হলেও, বাংলাদেশে নানা নৃগোষ্ঠী, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষ বাস করে। জীববৈচিত্র্য যেমন প্রকৃতির জন্য অপরিহার্য, মানবজাতির জন্য সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তাও অনুরূপ। তাই সংস্কৃতির বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বিকাশের দায়িত্ব আমাদের সকলের। এই অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর বসবাসের অঞ্চল এবং তাদের সাংস্কৃতিক পরিচিতি সম্পর্কে ধারণা পাব।

চিত্র- ২.১ : বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ

এই অধ্যায়ের পাঠ শেষে আমরা–

- বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের সংক্ষিপ্ত একটি পরিচয় দিতে পারব।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণ বাংলাদেশের কোন্ কোন্ অঞ্চলে বসবাস করে তা উল্লেখ করতে পারব।
- বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবস্থানের একটি অঞ্চলভিত্তিক ছক তৈরি করতে পারব।
- বাংলাদেশের মানচিত্রে চিহ্নিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক রূপরেখা বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবস্থান চিহ্নিত করতে পারব।

২০২০

পাঠ- ০১ : নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে নৃবৈজ্ঞানিক ধারণা

বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর বসবাসের অঞ্চল ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে এই অধ্যায়ে পরিচিত হব। তবে তার আগে, নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে আমাদের কিছু সাধারণ ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রথমেই জানা দরকার নৃগোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়। 'নৃ' শব্দের অর্থ হলো মানুষ, আর 'গোষ্ঠী' মানে হলো সামাজিক দল। সুতরাং, মানুষের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সামাজিক দলকে নৃগোষ্ঠী বলা হয়ে থাকে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষই কোনো না কোনো নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রত্যেকটি নৃগোষ্ঠীই একটি আরেকটি থেকে আলাদা। পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের এই সীমারেখা নৃগোষ্ঠীগুলো সর্বদাই বজায় রাখে। তাই একটি নৃগোষ্ঠীকে পৃথকভাবে চেনার জন্য আমাদেরকে সব সময় সেই নৃগোষ্ঠীর সীমারেখা বজায় রাখা ও সদস্যপদ লাভের উপায় সম্পর্কে জানতে হবে। সুনির্দিষ্ট কিছু সামাজিক নিয়মের মধ্য দিয়ে কোনো নৃগোষ্ঠীর সদস্যপদ লাভ করতে হয়। আর এই নিয়মগুলো পালনের সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর পরিচিতি ও সীমারেখা আমাদের কাছে আলাদাভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিছু উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি। যেমন, চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, মান্দি, বাঙালি ইত্যাদির প্রত্যেকটি আলাদা নৃগোষ্ঠী। একজন বাঙালি ব্যক্তি কি নিজের ইচ্ছামত কখনও চাকমা, কিংবা কখনও মান্দি হতে পারবে? অথবা একজন চাকমা ব্যক্তি কি চাইলেই কখনও সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর সদস্যপদ পাবে? কোনো ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো নৃগোষ্ঠীর সদস্যপদ লাভ করা সম্ভব নয়, তাই না? কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা জন্মসূত্রে আমাদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় ও সদস্যপদ লাভ করে থাকি। সুতরাং, চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, মান্দি কিংবা বাঙালি প্রত্যেকটি নৃগোষ্ঠীই তাদের আলাদা সামাজিক পরিচিতি ও সীমারেখা বজায় রাখে এর সদস্যপদ নির্ধারণের মাধ্যমে। মোটামুটিভাবে আমরা জন্মসূত্রেই কোনো না কোনো নৃগোষ্ঠীর সদস্য এবং অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর সদস্যদের থেকে আলাদা পরিচিতি ধারণ করি।

একটি নির্দিষ্ট নৃগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে আমরা সেই নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের সাথে পরিচিত হয়ে উঠি। প্রথম অধ্যায়ে আমরা সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনেছি। আমরা নিজ নিজ নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিভিন্ন দৃশ্যমান ও অদৃশ্য উপাদানগুলোর সাথে পরিচিত হই শৈশব থেকেই। সাধারণত দুটি নৃগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান হতে পারে। তাই বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক উপাদানে কিছু মিল বা সাদৃশ্য থাকলেও এদের সদস্যদের পরিচিতি সব সময়ই পৃথক থাকে। সুতরাং, সামাজিক সীমারেখা বজায় রাখার মধ্য দিয়েই নৃগোষ্ঠীগুলো তাদের পরিচিতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নৃগোষ্ঠীগুলোর সাংস্কৃতিক পরিচয় ও স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠে। যথা :

(১) নৃগোষ্ঠীর সদস্যপদ ও পরিচিতির সামাজিক স্বীকৃতি : যেকোনো নৃগোষ্ঠী তার সদস্যদের নির্দিষ্ট পরিচিতি দেয় বা আরোপ করে। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজের নৃগোষ্ঠীর পরিচিতি নিয়ে শৈশব থেকে বেড়ে উঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, নমিতা খীসা ছোটবেলা থেকেই চাকমা পরিচিতি নিয়ে বড় হয়েছে।

নমিতা খীসা আত্মপরিচিতি হিসেবে নিজেকে চাকমা বলে দাবি করে। আবার অন্যান্য নৃগোষ্ঠী যেমন বাঙালি, সাঁওতাল, মান্দি কিংবা মারমা সদস্যরা নমিতা খীসাকে চাকমা বলে স্বীকৃতি দেয়। এর মানে হলো, চাকমা কিংবা যে কোনো নৃগোষ্ঠী ও এর সদস্যদের পরিচিতির বৃহত্তর সামাজিক স্বীকৃতি রয়েছে।

(২) নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেতনা ও বোধ : সাধারণত যেকোনো নৃগোষ্ঠীর সদস্যদের মাঝে নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়ের চেতনা বা বোধ থাকে। অর্থাৎ, একটি নৃগোষ্ঠীর সকল সদস্যের মাঝে আত্মপরিচয়ের চেতনা ও জাতিসত্তার বোধ কাজ করে। তাই আমরা বিভিন্ন মানুষকে বলতে শুনি যে, 'আমরা বাঙালি', 'আমরা মান্দি', 'আমরা সাঁওতাল' কিংবা 'আমরা মারমা' ইত্যাদি। এই চেতনা ও বোধের জন্যই নৃগোষ্ঠীকে জাতিসত্তাও বলা হয়।

(৩) সামাজিক কর্মকান্ড, ভাববিনিময় ও আদান-প্রদানের সাধারণ ক্ষেত্র : একই নৃগোষ্ঠীর সদস্যদের জীবনধারা বা সংস্কৃতিতে যথেষ্ট মিল বা সাদৃশ্য রয়েছে। সাধারণত তারা একই ভাষায় কথা বলে ও ভাববিনিময় করে, তাদের জীবিকা নির্বাহ পদ্ধতি কাছাকাছি ধরনের কিংবা তাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও আদর্শেও যথেষ্ট মিল দেখা যায়। অর্থাৎ সংস্কৃতির বিভিন্ন দৃশ্যমান ও অদৃশ্য উপাদানগুলো একই নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা সকলেই জানে ও ধারণ করে। আবার, সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতেই বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সদস্যদের মাঝে পার্থক্য দেখা যায়।

এই তিনটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আমরা বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারি। তবে এখানে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, নৃগোষ্ঠী, ভাষাগোষ্ঠী, ধর্মগোষ্ঠী বা ধর্ম সম্প্রদায়, পেশাজীবী গোষ্ঠী ও মানব দল বা নরগোষ্ঠী এক কথা নয়। আমরা পরবর্তী সময়ে উপরের শ্রেণিতে এ ধরনের বিভিন্ন গোষ্ঠীর পার্থক্য সম্পর্কে জানতে পারব। বাংলাদেশের অধিবাসীদের উপর আজ পর্যন্ত কোনো নৃবৈজ্ঞানিক জরিপ হয় নি। এ কারণে আমাদের দেশে কতোগুলো নৃগোষ্ঠী আছে তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তাই আনুমানিকভাবে বলা হয় আমাদের দেশে ৪৫টিরও বেশি নৃগোষ্ঠী রয়েছে। সঠিক পদ্ধতিতে নৃবৈজ্ঞানিক জরিপ হলে নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা আরও বেশি হবে বলে ধারণা করা যায়।

অনুশীলন
কাজ- ১ : নৃগোষ্ঠী কাকে বলে?
কাজ- ২ : যে সকল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নৃগোষ্ঠীসমূহকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় তা উল্লেখ কর।

পাঠ- ০২ : বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের পরিচিতি

একটি দেশে যদি অনেক নৃগোষ্ঠী থাকে, তবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে ছোট আকারের নৃগোষ্ঠীগুলোকে ঐ দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলা হয়ে থাকে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে ইংরেজিতে বলা হয় 'Ethnic Minority'। আপাতদৃষ্টিতে মূলত বাঙালি অধ্যুষিত মনে হলেও, বাংলাদেশে নানা ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষ বসবাস করে। বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। এ দেশে বাঙালি নৃগোষ্ঠী হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। অপরদিকে, বাংলাদেশে বসবাসকারী বাঙালি ছাড়া অন্যান্য যেকোনো নৃগোষ্ঠীকেই জনসংখ্যার বিবেচনায় ছোট বলে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' বা 'Ethnic Minority' বলা যেতে পারে। তবে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে ছোট কিংবা বড় হলেও প্রতিটি নৃগোষ্ঠীই এক একটি স্বতন্ত্র নৃগোষ্ঠী ও অনন্য জাতিসত্তা।

বাংলাদেশে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' বা 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' বলতে মূলত অতীত ঐতিহ্যের ধারক ও প্রতিনিধিত্বকারী নৃগোষ্ঠীগুলোকে বোঝানো হয়। এই নৃগোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটপরিবর্তনের মধ্যেও নিজ নিজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে অনেকাংশে ধরে রেখেছে। এভাবে তারা নিজস্ব সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। অর্থাৎ, দেশের ও আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতির পরিবর্তনের সাথে তারা মিশে যায়নি একেবারে। বরং তাদের সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানসমূহে অনেকাংশে নিজস্বতা বজায় রেখেছে। সাধারণ কিছু সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। যেমন-

(১) নৃগোষ্ঠীর সদস্যদের মাঝে স্বতন্ত্র পরিচিতি ও জাতিসত্তার চেতনা ;

(২) অতীত ঐতিহ্য, বিশেষত প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ;

(৩) স্বতন্ত্র সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা ;

(৫) বসবাসকৃত অঞ্চলের প্রকৃতির সাথে নিবিড় ও গভীর সম্পর্ক;

(৬) আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নৃগোষ্ঠীগুলোর অবস্থান অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং আধিপত্যহীন।

এ ধরনের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নৃগোষ্ঠীগুলোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০' নামে একটি আইন প্রণয়ন করে। এই আইনে বাংলাদেশের 'অ-বাঙালি' ও অতীত ঐতিহ্যবাহী জাতিসত্তাগুলোকে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর ৯০টি দেশে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নৃগোষ্ঠীর প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ কোটি মানুষ বসবাস করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নৃগোষ্ঠীগুলো ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত যেমন, 'আদিবাসী', 'উপজাতি', 'ট্রাইব' (Tribe), 'এবরিজিনাল' (Aboriginal), 'জনজাতি', 'তফসিলি জাতি', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা', 'ফার্স্ট-নেশান' (First-Nation) প্রভৃতি। অন্যদিকে জাতিসংঘ এধরনের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নৃগোষ্ঠীগুলোকে 'ইন্ডিজেনাস পিপল' (Indigenous People) নামে অভিহিত করছে। বিশেষত সেপ্টেম্বর, ২০০৭-এ জাতিসংঘের ঘোষণাপত্রে 'ইন্ডিজেনাস পিপল' (Indigenous People) দের বিশেষ অধিকার স্বীকৃত হয়।

'ইন্ডিজেনাস পিপল্' (Indigenous People)-এর বাংলা আভিধানিক অর্থ 'আদিবাসী জনগোষ্ঠী'। জাতিসংঘের ব্যবহৃত 'ইন্ডিজেনাস পিপল্' (Indigenous People)-এর ধারণার উৎপত্তি মূলত অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা মহাদেশের প্রথম অধিবাসী জনগোষ্ঠীর ধারণা থেকে। অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা মহাদেশে প্রথম মানুষ বসবাস শুরু করে যথাক্রমে প্রায় ৪৫ হাজার এবং ১৬ হাজার বছর আগে। এই আদি মানুষেরাই দুই মহাদেশের প্রথম ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী। এই দুই মহাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরে অন্যান্য মহাদেশের কোনো জনগোষ্ঠীর মানুষ প্রবেশ করেনি। অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা মহাদেশে বহিরাগত শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী প্রবেশের ইতিহাস বেশি দিনের নয়। তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ যে, ১৪৯২ সালে কলম্বাস আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেছিলেন। এখানে আবিষ্কার বলতে বোঝানো হয়েছে যে, কলম্বাস ও তাঁর সহযাত্রীরা ইউরোপ মহাদেশ থেকে প্রথম আমেরিকা মহাদেশে প্রবেশ করেন ১৪৯২ সালে। ইউরোপ থেকে কলম্বাসের আগমনের পূর্বেও আমেরিকা মহাদেশে মানুষের বসবাস ছিল হাজার হাজার বছর ধরে। মাত্র পাঁচশত বছর আগে কলম্বাসের নেতৃত্বে শ্বেতাঙ্গদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পনের হাজার বছর ধরে

বসবাসকারী জনগোষ্ঠীরাই হলো আমেরিকার স্থানীয় ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী। বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও শ্বেতাঙ্গরা মূলত সেখানে বহিরাগত এবং বসতিস্থাপনকারী। তাই জাতিসংঘের ধারণা অনুযায়ী এই দুই মহাদেশে খুব সহজেই আদিবাসী ও বসতিস্থাপনকারী জনগোষ্ঠীর পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বসতি স্থাপনের ইতিহাসের দিক থেকে এ ধরনের পার্থক্য নিরূপণ করা সহজ কথা নয়।

বর্তমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী হাজার হাজার বছর ধরে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নৃগোষ্ঠীগুলো বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল ও উচ্চভূমি এলাকার অধিবাসী। বাংলাদেশে মাত্র কয়েকশত বছর পূর্বেও জনসংখ্যা স্বল্পতার কারণে এক নৃগোষ্ঠী অন্য নৃগোষ্ঠীর বসতি অঞ্চলে প্রবেশ করেনি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর বসবাস অঞ্চলের পরিধি ও সীমানা ছোট হয়ে আসছে। একই সাথে তারা বিভিন্নভাবে বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এজন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর অধিকার ও প্রাচীন ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রাচীন-ঐতিহ্যবাহী নৃগোষ্ঠীগুলোর বহু সদস্য অসীম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। অনেক ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে তারাও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। এছাড়াও ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন থেকে শুধু করে বিভিন্ন জাতীয় প্রয়োজনে ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নৃগোষ্ঠীর সদস্যদের অবদান সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ। এদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতেও তাদের অবদান প্রশংসনীয়। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে এ সকল নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে বাংলাদেশের অগ্রগতিতে অসামান্য ভূমিকা রেখে চলেছে। এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো সম্পর্কে এ অধ্যায়ের পরবর্তী পাঠগুলোতে আলোচনা করা হলো।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	বাংলাদেশ কেন একটি বৈচিত্রপূর্ণ দেশ ?
কাজ- ২ :	এ দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহকে যে সকল নামে ডাকা হয় তার একটি তালিকা তৈরী কর।

পাঠ- ০৩ : বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক মানচিত্র

বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলেই কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর মানুষদের একসাথে বসবাস করতে দেখা যায়। সকল নৃগোষ্ঠীর বসবাসের অঞ্চলগুলো বাংলাদেশের মানচিত্রে চিহ্নিত করে আমরা এ বৈচিত্র্য দেখতে পারি। এভাবে আমরা বাংলাদেশের একটা সাংস্কৃতিক মানচিত্র অংকন করতে পারি। শুধু তাই নয়, সাংস্কৃতিক মানচিত্রে আমরা বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে নানা তথ্যও উপস্থাপন করতে পারি। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের জন্য এ ধরনের মানচিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

সাংস্কৃতিক মানচিত্রে দেশের বিভিন্ন জায়গার ভৌগোলিক সীমারেখার সাথে সাংস্কৃতিক তথ্যের সরাসরি সংযোগ ঘটানো যায়। বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মাঝে কারা পরস্পরের কাছাকাছি বা প্রতিবেশী ও কারা পরস্পরের ২০২০

দূরবর্তী তা শনাক্ত করতে সাহায্য করবে এ মানচিত্র। একই সাথে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে নৃগোষ্ঠীগত তুলনা করতে পারব। তাই সাংস্কৃতিক মানচিত্রের মাধ্যমে আমরা যেমন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও স্থানসমূহ চিনতে পারব, তেমনিভাবে দেশের মানুষ ও সংস্কৃতিকে জানতে পারব।

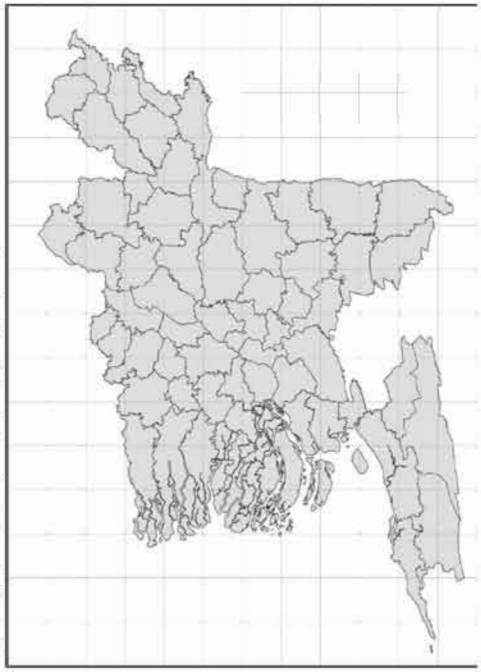

মানচিত্র- ২.১ : বাংলাদেশের মানচিত্র

বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে রংপুর, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, নওগাঁ ও রাজশাহী অঞ্চলে সাঁওতাল, ওরাঁও, মাহলে, রাজোয়াড়, গরাত, তুড়ি, রাজবংশী, মুণ্ডাসহ আরও অনেক নৃগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। আবার খুলনা বিভাগে মুণ্ডা ছাড়াও বুনো ও বাগদি নৃগোষ্ঠীর মানুষ দেখা যায়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি জেলা তিনটিতে অনেকগুলো ভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে, যেমন : ম্রো, খ্যাং, লুসাই, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, খুমি, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, পাঙ্খো এবং বম্ প্রভৃতি। মান্দি বা গারো নৃগোষ্ঠীর লোকদের বসতি বাংলাদেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। তবে ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, শেরপুর, টাঙ্গাইল, গাজীপুরে মান্দি বা গারোদের দেখা পাওয়া যায় বেশি। ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুরে আরও যে নৃগোষ্ঠীগুলোর বসতি দেখা যায় তারা হলো- হাজং, কোচ, ডালু, রাজবংশী প্রভৃতি। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে সিলেটের জৈন্তা পাহাড়ে খাসি নৃগোষ্ঠীর বসতি রয়েছে। এছাড়াও সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ এলাকায় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী, মৈইতৈই মণিপুরী এবং পাঙ্গান মণিপুরীদের বসবাস। পটুয়াখালী, বরগুনা ও কক্সবাজার জেলায় রয়েছে রাখাইন নৃগোষ্ঠীর বাস।

বাংলাদেশের মানচিত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিবরণ সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে তোমরা নিজেরাই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ম্যাপ তৈরি করতে পার। অর্থাৎ, বাংলাদেশের যেকোনো একটি নির্দিষ্ট থানা, উপজেলা বা জেলার চৌহদ্দি মানচিত্রে চিহ্নিত করার পর সেখানে দেখানো যায় কোন্ কোন্ নৃগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। মানচিত্রে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর উপস্থিতি বোঝানোর জন্য তোমরা বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন, রং বা সঙ্কেতের ব্যবহার করতে পার। এ প্রক্রিয়ায় একটি উপজেলা থেকে শুরু করে একটি জেলা বা বিভাগ হয়ে পুরো বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য মানচিত্রে ধারণ করা যায়। মানচিত্রে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর উপস্থিতি ও অবস্থানকে আলাদা রঙে সাজানো হলে তোমরা একটি ঝলমলে রঙিন বাংলাদেশ পাবে। তোমরা দেখতে পাবে আমাদের দেশ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে কতটাই রঙিন ও সমৃদ্ধ। শুধু মানচিত্রেই নয়, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের জীবনেও আনে রঙের ছোঁয়া। বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে আমরা সবাই সমৃদ্ধ হতে পারি। সকল সংস্কৃতির ঐক্য আর সম্প্রীতির ভিত্তিতে আমরা ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে আরও রঙিন ও সুন্দর করে তুলতে পারব।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	সাংস্কৃতিক মানচিত্র কী? সাংস্কৃতিক মানচিত্রের প্রয়োজনীয়তা কী?
কাজ- ২ :	বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক মানচিত্র অঙ্কন কর।

পাঠ- ০৪ : ঢাকা বিভাগে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ

ঢাকা বিভাগের প্রায় সব জেলাতেই বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা নৃগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। এসব জেলার মধ্যে শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, রাজবাড়ী, ফরিদপুর ও ঢাকা জেলাতে এদের বসবাস বেশি। ঢাকা বিভাগে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো হলো- মান্দি (গারো), হাজং, কোঁচ, রাজবংশী, ডালু, হো, মাহাতো, মুন্ডা, ওরাঁও প্রভৃতি। এছাড়া, মূলত চাকরি ও পড়াশুনোর সূত্রে অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষও ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় বসবাস করে। ঢাকা বিভাগে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর জনসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। এদের মধ্যে মান্দি জাতিসত্তা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

মান্দি জাতিসত্তা : বাংলাদেশে মান্দিরা গারো নামে অধিক পরিচিত। কিন্তু এই নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা নিজেদের মান্দি নামে পরিচয় দিতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। নিজেদের ভাষাকে তারা বলে 'আচিক কুসিক' অর্থাৎ পাহাড়ি ভাষা। মান্দিদের রয়েছে বিভিন্ন দল, গোত্র ও উপগোত্র। এসব গোত্রকে তাদের ভাষায় 'চাচ্চি' এবং বংশকে 'মাহারি' বলা হয়। মান্দি সমাজ মাতৃসূত্রীয়, অর্থাৎ মাতা হলেন পরিবারের প্রধান। সন্তানদেরকে মায়ের উপাধি গ্রহণ করতে হয়। মায়ের সূত্রেই মান্দিদের বংশধারা বা 'মাহারি' নির্ধারিত হয়। সমতলের গারোদের ভাষার নাম 'লামদানী'।

বাংলাদেশের মান্দি সমাজ মূলত কৃষিনির্ভর। আগে তারা প্রধানত জুমচাষ করতো। তবে সমাজের শিক্ষিত অনেকেই এখন সরকারি-বেসরকারি চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ নানা পেশায় নিযুক্ত। তাদের সামাজিক উৎসবগুলো মূলত কৃষিকেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে বৃহত্তম উৎসব হলো 'ওয়ানগালা'।

চিত্র- ২.৩ : মান্দিদের ঐতিহ্যবাহী সাজ

মান্দিদের আদি ধর্মের নাম 'সাংসারেক' আর প্রধান দেবতার নাম 'তাতারা রাবুগা'। কিন্তু মান্দি জাতিসত্তার অধিকাংশ মানুষ বর্তমানে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করায় খ্রিষ্ট-ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলোই এখন তাদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

মান্দি নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম 'দকমান্দা' ও 'দকশারি'। পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হলো 'গান্দো'। মান্দিদের বেশ কিছু

ঐতিহ্যবাহী জনপ্রিয় খাদ্যও আছে। এমন একটি খাবারের নাম হল 'খাড়ি'। মুরগির মাংস দিয়ে এটি রান্না করা হয়। অতীতে মান্দিদের মাঝে দো'চালা লম্বা বাসগৃহ বেশ জনপ্রিয় ছিল। এ ধরনের ঘরকে মান্দি ভাষায় বলা হয় 'নক'।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	ঢাকা বিভাগে বসবাসকারী বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নামের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
কাজ- ২ :	মান্দি জাতিসত্তার বসবাসের অঞ্চল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনধারার কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

পাঠ- ০৫ : চট্টগ্রাম বিভাগে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ

চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে অর্থাৎ খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় ১৪টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বসবাস করে। জাতিসত্তাগুলো হলো - খুমি, চাক্, খ্যাং, চাক্মা, তঞ্চঙ্গ্যা, গুর্খা, ত্রিপুরা, পাংখো, বম্, মারমা, ম্রো, লুসাই, বনযোগী এবং অসমিয়া। আরেকটি নৃগোষ্ঠী রাখাইনদের বড় অংশের বসবাস কক্সবাজার জেলায়। বরগুনা, পটুয়াখালী ও বরিশাল জেলাতেও কিছু রাখাইন বাস করে। ত্রিপুরাদের বসতি আরও বিস্তৃত। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও তাদের বসবাস রয়েছে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, ফরিদপুর, সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলায়। তাছাড়া সংখ্যায় কম হলেও চট্টগ্রাম বিভাগের সমতল জেলাগুলোতে গুর্খা, বাউড়ি প্রভৃতি জাতিসত্তার মানুষ বসবাস করে। চট্টগ্রাম বিভাগে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর জনসংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। এদের মধ্যে এখানে চাকমা জাতিসত্তা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।

চাকমা জাতিসত্তা : পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে চাকমারা জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের বৃহত্তম। রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজার জেলাতে তাদের বসবাস রয়েছে। এছাড়া চাকরিসূত্রে চাকমারা ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বসবাস করছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের মিজোরাম, ত্রিপুরা, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ও দিল্লীসহ বিভিন্ন রাজ্যে অনেক চাকমা বসবাস করে।

খাগড়াছড়ি জেলার কিছু অংশ এবং রাঙ্গামাটি জেলা নিয়ে গঠিত হয়েছে চাকমা সার্কেল যার প্রধান হলেন চাকমা চীফ বা চাকমা রাজা। পার্বত্য চট্টগ্রামের আরও দুটি সার্কেলের মতো চাকমা সার্কেলও অনেক মৌজা নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক মৌজায় রয়েছে কতগুলো গ্রাম। চাকমা ভাষায় গ্রামকে আদাম বা পাড়া বলা হয়। গ্রাম প্রধানের উপাধি হলো 'কার্বারী'। কয়েকটি 'আদাম' বা গ্রাম নিয়ে গঠিত হয় এক-একটি মৌজা। মৌজা প্রধান হলেন 'হেডম্যান' যার নেতৃত্বে মৌজার অধিবাসীদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত খাজনা আদায়, বিভিন্ন সামাজিক বিরোধের বিচারসহ এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম এবং জনগণের ভালমন্দ দেখভালের কাজগুলো পরিচালিত হয়। মৌজা প্রধানের সাথে আলাপ-আলোচনা করে চাকমা রাজা গ্রাম প্রধান বা কার্বারীকে নিয়োগ দেন। আর সাধারণত রাজার সুপারিশ অনুযায়ী মৌজার হেডম্যানকে নিয়োগ দেন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক।

প্রথাগতভাবে চাকমা রাজা হলেন সমাজপতি এবং সমাজের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। চাকমা রাজা প্রথাগত আইন অনুযায়ী নিজ সার্কেলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সামাজিক বিচারকাজ পরিচালনা করেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সরকারের উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। চাকমা সার্কেলের বর্তমান রাজার নাম ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়। তিনি চাকমা রাজবংশের ৫১তম রাজা।

চাকমা সমাজের চারণ কবি 'গেংহুলি'দের পালাগান থেকে জানা যায় যে, সুদূর অতীতে চাকমারা চম্পকনগর রাজ্যে বসবাস করতো। চাকমা যুবরাজ বিজয়গিরি ২৬ হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধাভিযানে বের হয়ে একে একে চট্টগ্রাম, আরাকান, কুকি রাজ্য (লুসাই পাহাড়) প্রভৃতি অঞ্চল জয় করার পর চম্পকনগরে ফিরে না গিয়ে নববিজিত অঞ্চলগুলোর একাংশে নতুন রাজ্য স্থাপন করে সেখানে বসবাস শুরু করেন। যুবরাজ বিজয়গিরি আনুমানিক ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে উল্লেখিত রাজ্যগুলো জয় করেন। বর্তমান কালের চাকমারা রাজা বিজয়গিরির সেই আরাকান ও চট্টগ্রাম বিজয়ী ২৬ হাজার সৈন্যের বংশধর বলে অনেকের ধারণা। তবে চাকমারা নিজেদেরকে শাক্যবংশীয় হিসেবে পরিচয় দিতেও গর্ববোধ করে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক মহামানব গৌতম বুদ্ধ শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শাক্য শব্দ থেকে পরে চাকমা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেক গবেষক দাবি করেন।

চাকমা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক এবং মূলত কৃষিনির্ভর। জুমচাষ এবং কৃষিজমি চাষাবাদ উভয় ক্ষেত্রেই তারা সমান পারদর্শী। চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামে বৌদ্ধমন্দির রয়েছে। বৈশাখী পূর্ণিমাসহ বিভিন্ন পূর্ণিমার দিনে তারা বৌদ্ধমন্দিরে ফুল, খাদ্যদ্রব্যসহ নানা উপাচার দিয়ে এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে বুদ্ধকে পূজা করে। চাকমা সমাজের একজন বোধিজ্ঞানপ্রাপ্ত সাধক বনভান্তে (শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির) বৌদ্ধদের কাছে পরম পুজনীয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। রাঙ্গামাটিতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত চাকমা রাজ বনবিহারে বৌদ্ধ পূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান এবং অন্যান্য পূর্ণিমা তিথিতে ভক্ত, অনুসারী এবং ধর্মানুরাগীদের ঢল নামে।

চিত্র- ২.৪ : চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক

প্রথাগতভাবে রাজার শাসনাধীন হলেও চাকমা জাতিসত্তা নানা রাজনৈতিক পরিবর্তন ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ দুই যুগ ধরে চলা রাজনৈতিক সংঘাতের পর ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড তদারকির জন্য 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ' গঠন করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলের বিশেষ ঐতিহাসিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে দেশের সাধারণ সরকারি প্রশাসন, তিন পাহাড়ি রাজা এবং আঞ্চলিক পরিষদের সমন্বিত শাসনাধীনে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল পাহাড়ি জনগোষ্ঠী। প্রথাগত নেতৃত্বের বাইরে এই জাতীয় এবং আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রভাবও চাকমা সমাজে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	চট্টগ্রাম বিভাগে বসবাসকারী বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নামের একটি তালিকা প্রস্তুত কর ।
কাজ- ২ :	চাকমা জাতিসত্তার বসবাসের অঞ্চল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনধারার কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর ।

পাঠ- ০৬ : সিলেট বিভাগে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ

সিলেট বিভাগে মোট ৪টি জেলা - সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ। এসব জেলায় বাঙালি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বহু ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বাস করে। তারা হলো - খাড়িয়া, মান্দি, ওরাঁও, ত্রিপুরা, হাজং, খাসি, বিষ্ণুপ্রিয়া, মেইতেই, পাঙ্গান, বাগদি, বানাই, বীন, ভূমিজ, গন্ড, গঞ্জু, গুর্খা, হালাম, মুষহর, মাহাতো, নায়েক, নুনিয়া, পানিখা, পাত্র, শবর, কোচ, ডালু, সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, মালো, মিকির, মাহ্লে, খন্দ প্রভৃতি। তবে সিলেট অঞ্চলে জনসংখ্যার দিক থেকে বাঙালি ছাড়া অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী, মেইতেই মণিপুরী ও খাসি নৃগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ। সিলেট বিভাগে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মোট জনসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ, যাদের অধিকাংশই চা বাগানে কাজ করে। বাংলাদেশের মণিপুরী জাতিসত্তাসমূহ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলো।

মণিপুরী জাতিসত্তাসমূহ : মণিপুরী জাতিসত্তাসমূহের বসবাস সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলায়। উনবিংশ শতাব্দীর (১৮১৯-১৮২৬) প্রথম দিকে বার্মার সৈন্যরা ভারতের মণিপুর রাজ্য আক্রমণ করলে সেখানকার কিছু জাতিসত্তার মানুষ এসে সিলেট অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। ভারতের মণিপুর রাজ্য থেকে আসার কারণে বাংলাদেশে তারা মণিপুরী নামে পরিচিত। সাধারণভাবে মণিপুরী নামে পরিচিত হলেও এদের মাঝে রয়েছে তিনটি পৃথক ও স্বতন্ত্র জাতিসত্তা। মণিপুরী নামে পরিচিত এই জাতিসত্তা বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ হলো : (১) মেইতেই মণিপুরী, (২) বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী এবং (৩) পাঙ্গান মণিপুরী। এই তিনটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে দেওয়া হলো।

(১) মেইতেই জাতিসত্তা : সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলাতে মেইতেইদের জনসংখ্যা বেশি। মেইতেইদের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা রয়েছে ভারতের মনিপুর রাজ্যে। তবে এছাড়াও ভারতের ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয় রাজ্যে, চীনের ইয়ুনান প্রদেশে এবং মিয়ানমারে মেইতেইদের বসবাস রয়েছে। বাংলাদেশের মেইতেই সমাজ এখনও গ্রাম ও কৃষিনির্ভর। মেইতেইদের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য, দৃশ্যশিল্প, তাঁতবস্ত্র প্রভৃতি ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

চিত্র- ২.৫ : ঐতিহ্যবাহী মণিপুরী নৃত্য

মেইতেইদের মাতৃভাষা 'মেইতেইলোন' যা টিবেটো-বার্মান শাখার কুকি-চিন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। মেইতেইদের প্রাচীন ধর্মের নাম 'অপোকপা'। তাদের প্রধান দেব-দেবীরা হলেন সানামাহি, পাখংবা, অপোকপা, শিদাবা। অতি প্রাচীন কাল থেকে মেইতেইদের মাঝে নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত। যারা এই চিকিৎসার কাজটি করেন তারা 'মাইবা' বা 'মাইবী' নামে পরিচিত ছিল।

(২) বিষ্ণুপ্রিয়া জাতিসত্তা : বেশিসংখ্যক বিষ্ণুপ্রিয়া বাস করে মৌলভীবাজার জেলায়। এদের আদি নিবাস ভারতের মনিপুর রাজ্যে। বিষ্ণুপ্রিয়াদের কয়েকটি পরিবার মিলে একটি পাড়া গড়ে উঠে। প্রতিটি পাড়া বা গ্রামে রয়েছে এক একটি দেব মন্দির ও মন্ডপ। এসকল মন্দির ও মন্ডপ ঘিরে আবর্তিত হয় পাড়ার যাবতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকান্ড। প্রতিটি গ্রামে মন্দির পরিচালনা ও দেবতার পূজা-অর্চনার জন্য একটি ব্রাহ্মণ পরিবার থাকে। গ্রামে রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত, আবার কয়েকটি গ্রামে রয়েছে পরগনা পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত পরিচালনার জন্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে থেকে বিজ্ঞজনকে নির্বাচন করা হয়। বিষ্ণুপ্রিয়া সমাজে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পরগনা পঞ্চায়েতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

বিষ্ণুপ্রিয়ারা বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী। তাদের প্রধান উৎসব রাসযাত্রা, রথযাত্রা ইত্যাদি। কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথীতে রাসপূর্ণিমা উদযাপন করা হয়। রাসপূর্ণিমায় গোষ্ঠলীলা বা রাখাল রাস ও রাসলীলার আয়োজন করা হয়। সংকীর্তন হলো অন্যতম বৃহত্তর ধর্মীয় উৎসব। বিষ্ণুপ্রিয়াদের মাতৃভাষা ইন্দো-আর্যীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বিষ্ণুপ্রিয়া লোকেরা পাঁচটি গোত্রে বিভক্ত। একই গোত্রের মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া সমাজে বিবাহ নিষিদ্ধ।

(৩) পাঙ্গান জাতিসত্তা : সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে (১৬০৬ খৃ:) হবিগঞ্জের তরফ অঞ্চলের পাঠান শাসক খাজা ওসমানের সৈন্যাধ্যক্ষ মোহাম্মদ সানীর নেতৃত্বে ইসলাম ধর্মের অনুসারী এক দল সৈন্যবাহিনী মণিপুর রাজ্যে অভিযান চালায়। তখনকার মণিপুরের রাজা খাগোম্বার সাথে এক সন্ধির ফলে এই বাহিনী মণিপুরে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে মোগল শাসক মীর জুমলা আসাম আক্রমণে বিপর্যস্ত হলে ঐ সৈন্যবাহিনীর অনেকে পার্শ্ববর্তী রাজ্য মণিপুরে আশ্রয় নেয়। তারা মণিপুরের স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং ইসলাম ধর্ম প্রচার করে। মণিপুরের মুসলমান জনগোষ্ঠীরাই পাঙ্গান নামে পরিচিত।

পাঙ্গানরা 'মেইতেইলোন' ভাষায় কথা বলে যা টিবেটো-বার্মান শাখার কুকি-চিন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এরা সবাই ইসলাম ধর্মের সুন্নী মতাবলম্বী। নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই সাধারণত বিয়ে হয়। বর্তমানে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ অংশে এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	সিলেট বিভাগে বসবাসকারী বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নামের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ- ০৭ : রাজশাহী বিভাগে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ

রাজশাহী বিভাগে মোট ৮টি জেলা। এসব জেলার প্রত্যেকটিতে বাঙালি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি নানা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। কোথাও রয়েছে তাদের ঘনবসতি, আবার কোথাওবা তাদের বসবাস ছড়িয়ে-

ছিটিয়ে। রাজশাহী বিভাগে যেসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বাস করে তাঁরা হলো - সাঁওতাল, পাহাড়িয়া, রাজবংশী, ওরাঁও, মাহাতো, মুন্ডা, ভুঁইমালী, ভুঁইয়া, ভূমিজ, খাড়িয়া, কোডা, মালো, পাহান, রাজোয়াড়, তুড়ি, কোঁচ, মুষহর, হো, মাহুলে, বর্মণ, গন্ড প্রভৃতি। এই বিভাগে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর জনসংখ্যা আনুমানিক ছয় লক্ষ। নিচে ওরাঁও জাতিসত্তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

চিত্র - ২.৬ : ওরাঁও নৃগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা

ওরাঁও জাতিসত্তা : ওরাঁওরা বহু শতাব্দী ধরে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে বসবাস করে আসছে। বর্তমানে ওরাঁওরা উত্তরবঙ্গের পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, রংপুর, জয়পুরহাট, নওগাঁ, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, সিরাজগঞ্জ ও নীলফামারী জেলায় বসবাস করে। এছাড়া সিলেট অঞ্চলের হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলাতেও বেশ কিছু ওরাঁও বাস করে। এখানে তারা মূলত চা বাগানে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষ এবং তাদের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের ওরাঁওদের জীবনযাত্রায় বেশ পার্থক্য রয়েছে। গাজীপুর জেলায়ও কিছু সংখ্যক ওরাঁও বাস করে। নওগাঁ ও রংপুর জেলায় তাদের জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি।

ওরাঁও জাতিসত্তা মূলত প্রকৃতি পূজারি। তাদের সৃষ্টিকর্তার নাম ধার্মেশ। তিনি প্রধান দেবতা এবং সূর্যে অবস্থান করেন বলে সূর্যকেও তারা তাদের দেবতা মানে। ওরাঁওদের সমাজে প্রায় সারা বছর নানা পূজা পার্বন ও উৎসব পালিত হয়। এ ধরনের কিছু উৎসব হলো– সারহুল, কারাম, খারিয়ানি এবং ফাগুয়া। এদের মধ্যে কারাম হলো সবচেয়ে বড় উৎসব। প্রচলিত বিশ্বাস মতে, একসময় ওরাঁও জাতি শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে কারাম বৃক্ষের নিচে আশ্রয় নেয়। এই বৃক্ষ শত্রুর হাত থেকে তাদের রক্ষা করে বলে এর স্মরণে তারা ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে কারাম উৎসবের আয়োজন করে থাকে।

এক সময় বরেন্দ্র অঞ্চল বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল বলে শিকার ছিল তাদের অন্যতম জীবিকা। নিজ অঞ্চলে বসবাসের এলাকা ও কৃষিজমি কমে যাওয়ায় তারা এখন শহরমুখী হয়ে পড়ছে এবং নানা পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। নারীরা বিভিন্ন হস্তশিল্প কেন্দ্র ও বেসরকারি সংস্থায়ও সম্পৃক্ত হচ্ছে।

ওরাঁওদের মধ্যে দুটি ভাষার প্রচলন রয়েছে। একটির নাম কুঁড়ুখ, যা দ্রাবিড় পরিবারভুক্ত এবং অপরটির নাম সাদরি। সাদরি ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের জীবন ও সংস্কৃতির একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে লোকসঙ্গীত, লোকনাট্য, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নৃত্যগীত, বাদ্য-বাজনা প্রভৃতি। নানা ধরনের পিঠাপুলি দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন ওরাঁও সমাজে একটি ঐতিহ্যবাহী রীতি।

ওরাঁও জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিক নানা ঘটনার সাক্ষী ও অংশীদার। ১৯৫০ সালে ইলা মিত্রের নেতৃত্বে নাচোলে তেভাগা আন্দোলন নামে যে কৃষক আন্দোলন শুরু হয় তাতে তাঁরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শত শত ওরাঁও যুবক অংশ নিয়েছিল। ওরাঁওদের মধ্যে ৫৫টি গোত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। একই

গোত্রের নারী-পুরুষের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। তাদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ওরাঁওদের যে গ্রাম সংগঠন আছে তাকে বলা হয় পাঞ্চেস। প্রতিটি গ্রামে একজন সর্দার বা মহাতোষ এবং একজন পুরোহিত বা নাইগাস থাকে। গ্রামের সাত- আটজন বয়স্ক ব্যক্তি দ্বারা তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য পাঞ্চেস গঠিত হয়।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	রাজশাহী বিভাগে বসবাসকারী বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নামের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
কাজ- ২ :	ওরাঁও জাতিসত্তার বসবাসের অঞ্চল উল্লেখ কর।

পাঠ- ০৮ : রংপুর বিভাগে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ

রংপুর বিভাগের মোট ৮টি জেলার প্রত্যেকটিতেই ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ বাস করে। এসব জেলায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো হলো-সাঁওতাল, ওরাঁও, মালো, তুরি, কোচ, কোলহে, পাহাড়িয়া, মাহাতো, মুষহর, মাহ্‌লে, রাজবংশী প্রভৃতি। রংপুর বিভাগে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনসংখ্যা আনুমানিক দুই লক্ষ। এদের মধ্যে নিচে সাঁওতাল জাতিসত্তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

সাঁওতাল জাতিসত্তা : বাংলাদেশে সাঁওতালরা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতিসত্তা। উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, নবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী প্রভৃতি জেলায় তারা বাস করে। উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে তাদের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সাঁওতালরা নিজেদের হড় বলে। ব্রিটিশ সরকার ১৮৩৬ সালে ভারতবর্ষের বিহার রাজ্যে সাঁওতালদের নিরাপদ বসবাসের জন্য একটি এলাকা নির্দিষ্ট করে দেয়, যা সাঁওতাল পরগণা নামে পরিচিত। পরে সেখানে বহিরাগত মহাজন ও ব্যবসায়ীরা তাদের উপর নিপীড়ন শুরু করে। তারা সহজ সরল সাঁওতালদেরকে বিভিন্ন কৌশলে ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলে। এই শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাঁওতালরা অবশেষে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮৫৫ সালের সেই বিদ্রোহ ইতিহাসে 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নামে পরিচিত হয়। সাঁওতাল ভাষায় বিদ্রোহকে বলা হয় 'হুল'। এই বিদ্রোহের নায়ক দুই ভাই সিধু ও কানহুকে তারা তাদের জাতীয় বীর হিসেবে ভক্তি করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার মহাজনদের পক্ষ নিয়ে কঠোর হস্তে সেই বিদ্রোহ দমন করে। এতে প্রায় ১০ হাজার সাঁওতাল বিদ্রোহী নিহত হন। ঐ সময় সাঁওতালরা দলে দলে বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে ও আসামে পাড়ি জমান বলে কোনো কোনো ইতিহাসবিদ মনে করেন। আবার স্থানীয় জমিদাররা ব্যাপক পতিত জমি চাষাবাদের জন্য এই অঞ্চলে তাদেরকে নিয়ে আসেন বলেও অনেকের ধারণা। আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১ অনুসারে ১,৪৭,১১২ (এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার একশত বার) জন সাঁওতাল বাংলাদেশে বসবাস করে।

সাঁওতালী ভাষায় দেবতাকে বলা হয় 'বোঙ্গা'। তাদের আদি দেবতা হল সূর্য। অন্যান্য যেসব দেবতাকে সাঁওতালরা পূজা করে তাদের মধ্যে 'মারাং বুরু', 'অড়াংক্ বোঙ্গা', 'আবগে বোঙ্গা', 'জাহের এরা', 'গোঁসাই এরা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সাঁওতালদের বিশ্বাস- সৃষ্টিকর্তা এবং আত্মা অমর ও অবিনশ্বর।

তারা সর্বত্র বিরাজমান এবং তাদেরকে তুষ্ট করার উপরই মানব জাতির ভাল-মন্দ নির্ভর করে। সাঁওতাল সমাজে হিন্দু দেব-দেবীর প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। সাঁওতালদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পুরুষরা বাম হাতে কব্জির উপরে বেজোড় সংখ্যক উল্কি চিহ্ন আঁকে। মেয়েরাও নিজেদের হাতে ও বুকে উল্কি চিহ্ন আঁকে। উল্কিবিহীন অবস্থায় কেউ মারা গেলে পরকালে যমরাজ তাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে থাকেন বলে তাদের বিশ্বাস। অনেকে এখন খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিতও হচ্ছে। ফলে ক্রমশ বদলে যাচ্ছে তাদের সংস্কৃতি ও জীবনধারা।

সাঁওতাল সমাজের মূল ভিত্তি হচ্ছে গ্রাম-পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত পরিচালনার জন্য সাতজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি থাকেন। তারা হলেন মানুঝহি, জগমানুঝহি, গডেৎ, পারাণিক, জগ পারাণিক, নায়কে ও কুডাম নায়কে প্রভৃতি। জানগুরু পঞ্চায়েত সদস্য নয়, তাঁকে তান্ত্রিক ও ধর্মগুরু হিসেবে গণ্য করা হয়। 'মানুঝহি' হলেন গ্রামপ্রধান। তার নেতৃত্বে গ্রামের সবকিছু পরিচালিত হয়।

চিত্র- ২.৭ : সাঁওতাল পরিবার

সাঁওতালদের ভাষা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাপরিবারের অন্তর্গত। সাঁওতাল সমাজ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। সাঁওতালী ভাষায় এসব গোত্রকে 'পারিস' বলা হয়। সাঁওতাল সমাজ পিতৃপ্রধান। পিতার সূত্রে সন্তানের গোত্র পরিচয় নির্ধারিত হয়। পিতার সম্পত্তিতে পুত্রদের সমান অধিকার থাকলেও কন্যাসন্তান কোনো সম্পত্তি দাবি করতে পারে না। তাদের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। তবে সাঁওতাল সমাজে নারীকে উর্বরা শক্তির প্রতীক বলে গণ্য করা হয়। তাদের বিশ্বাস নারীরাই সর্বপ্রথম কৃষিকাজ আবিষ্কার করেছিল। নারী ও পুরুষ উভয়েই ক্ষেতে কাজ করে। ধান, সরিষা, তামাক, মরিচ, ভুট্টা, তিল, ইক্ষু প্রভৃতি ফসল তারা উৎপাদন করে। তাছাড়া খেজুর পাতা ও ছন দিয়ে তৈরি নানা প্রকার মাদুর, ঝাড়ু নিজেদের ব্যবহারের পাশাপাশি তারা সেসব জিনিস হাটেও বিক্রি করে।

সাধারণত সাঁওতালরা মাটির দেয়ালের উপর শন বা খড়ের ছাউনি দিয়ে তৈরি চারচালা ঘরে বসবাস করে। অতিথি আপ্যায়নসহ বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে 'হাঁড়িয়া' (নিজেদের তৈরি পানীয়) পরিবেশন তাদের সংস্কৃতির অংশ। সাঁওতালদের নিজস্ব উৎসবাদির মধ্যে বাহা, সোহ্‌রাই এবং এরোক উৎসব উল্লেখযোগ্য। তাদের সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো লাগ'ড়ে নাচ। সাঁওতালদের বিয়ের অনুষ্ঠানে আয়োজিত হয় 'দং' নাচ।

অনুশীলন

কাজ- ১ : রংপুর বিভাগে বসবাসকারী বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নামের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

২০২০

কাজ- ২ : সাঁওতাল জাতিসত্তার বসবাসের অঞ্চল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনধারার কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

পাঠ- ০৯ : বরিশাল ও খুলনা বিভাগে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ

বরিশাল ও খুলনা বিভাগে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা আনুমানিক আড়াই লক্ষ। বরিশাল বিভাগে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হলো রাখাইন। তাদের বসবাস মূলত পটুয়াখালী, বরিশাল ও বরগুনা জেলায়। এছাড়া চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলাতেও রাখাইনদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বাস করে। খুলনা বিভাগে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনবসতি দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। এই বিভাগের বিভিন্ন জেলায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো হলো- মুন্ডা, মাহাতো, বুনো, বাগদি, রাজোয়াড়, রাজবংশী প্রভৃতি। মূলত কুষ্টিয়া, যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলাতেই এসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বসবাস করছে। নিচে মুন্ডা জাতিসত্তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

মুন্ডা জাতিসত্তা : বাংলাদেশে মুন্ডারা উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবনের কাছাকাছি এলাকায় বাস করে। ঝিনাইদহ জেলায় এবং বৃহত্তর সিলেটের চা বাগান এলাকাতে বেশ কিছু মুন্ডা পরিবার আছে। খুলনা জেলার কয়রা ও ডুমুরিয়া উপজেলার কয়েকটি গ্রামে তাদের বসতি রয়েছে। এছাড়া সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর, দেবহাটা এবং তালা উপজেলায়ও মুন্ডাদের একটি বড় অংশ বাস করে। ভারতের ঝাড়খন্ড, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড় এবং উড়িষ্যা রাজ্যে অধিক সংখ্যক মুন্ডা বাস করে।

মুন্ডা জনগোষ্ঠী প্রধানত কৃষিজীবী। মুন্ডা বিদ্রোহ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে একটি স্মরণীয় বিদ্রোহ। বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ শুরু হয়। তিনি ইংরেজদের শাসন এবং দেশীয় শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে একটি সমৃদ্ধিশালী সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। দৃঢ় আদর্শের জন্য তাকে মুন্ডারা ভগবান মনে করে। ১৮৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যের সিংভূম, তামার ও বাসিয়ার অঞ্চলে ব্রিটিশ সরকারের অফিস, পুলিশ স্টেশন, মিশন হাউস আক্রমণ করেন এবং অবশেষে গ্রেপ্তার হন। ১৯০০ সালে রাঁচি কারাগারে তার রহস্যজনক মৃত্যু হয়। শুধুমাত্র তীর-ধনুক নিয়েই তিনি পরাক্রমশালী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

মুন্ডারা ১৩টি 'কিলি' বা গোত্রে বিভক্ত। তাদের নিজস্ব মোড়ল ও রাজা আছে। মোড়ল একটা গোত্রকে আর রাজা কয়েকটি গোত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তারা সামাজিক ও ধর্মীয় নানা সমস্যায় দিকনির্দেশনা ও সমাধান দিয়ে থাকেন। মুন্ডাদের বাড়িঘর মাটি দিয়ে তৈরি। সমাজে ছেলে সন্তানরাই পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। মুন্ডাদের ধর্মের নাম স্বর্ণা। তাদের বিশ্বাস সিং বোঙ্গা বা সূর্য প্রভু সকল শক্তির উৎস এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা।

চিত্র- ২.৮ : বীরসা মুন্ডা

২০২০

মুন্ডাদের ভাষার নাম মুন্ডারি। তবে বর্তমানে তারা ওরাঁওদের সাদরি ভাষাকেও সমানভাবে গ্রহণ করেছে। তাদের নাচের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তারা ধর্মীয় এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে লাল ও সাদা মাটি দিয়ে চিত্রকর্ম, নানা আল্পনা ও শিল্পকর্ম আঁকে। তাদের বাড়িঘরেও অনুরূপ আল্পনা শোভা পায়।

অনুশীলন

কাজ- ১ : খুলনা ও বরিশাল বিভাগে বসবাসকারী বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নামের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

কাজ- ২ : মুন্ডা জাতিসত্তার বসবাসের অঞ্চল, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন এবং তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনধারার কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. সাঁওতাল বিদ্রোহ কতো সালে হয়?

ক. ১৮৫৫ খ. ১৮৫৭

গ. ১৮৫৯ ঘ. ১৮৬০

২. কোন স্থানে ওরাঁওদের জনসংখ্যা অধিক?

ক. বান্দরবান খ. কাপ্তাই

গ. নওগাঁ ঘ. সিলেট

৩. রাজশাহী অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তা কোনগুলো?

ক. সাঁওতাল, মাহাতো, কোডা, পাহাড়িয়া

খ. সাঁওতাল, পাহাড়িয়া, ম্রো, চাকমা

গ. চাকমা, মারমা, খাসিয়া, পাহাড়িয়া

ঘ. খাসিয়া, পাহাড়িয়া, চাকমা, হাজং

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সীমা মারমা ছোটবেলা থেকে মারমা হিসেবে বেড়ে উঠেছে। তাই সে নিজেকে মারমা বলে দাবি করে। বাঙালি, সাঁওতাল, মান্দি ও চাকমারা সীমাকে মারমা বলে স্বীকৃতি দেয়।

২০২০

৪. সীমার পরিচয় কোন্‌টি?

ক. বৃহৎ নৃগোষ্ঠী　　খ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

গ. ভাষাগোষ্ঠী　　ঘ. নরগোষ্ঠী

৫. সীমার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক পরিচয়ের যে বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে তা হলো-

i. সদস্যপদ ও পরিচিতির সামাজিক স্বীকৃতি

ii. ভাবের আদান-প্রদানের সাধারণ ক্ষেত্র

iii. গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার চেতনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. অন্তরা তার বান্ধবী সুশীলা দ্রং এর বাড়ি বেড়াতে ময়মনসিংহ যায়। সেখানে গিয়ে সে দেখে তাদের বাড়িতে মায়ের কথার প্রাধান্য বেশি, সন্তানেরা মায়ের উপাধি গ্রহণ করেছে এবং বংশধারাও মায়ের সূত্রেই নির্ধারিত হয়। অন্তরা পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমাদের সাথেও পরিচিত ছিল। সুশীলা দ্রং এর সাথে মারমাদের আচরণগত পার্থক্য ছিল।

ক. 'নৃ' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আদি ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ধারক'- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সুশীলা দ্রং এর পরিচিতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুশীলা দ্রং এর সাথে মারমাদের পার্থক্য তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২. আবির ও প্রমীলা মার্ডি কারমাইকেল কলেজের মাঠে বসে কথা বলছে-

আবির : উনবিংশ শতাব্দীতে শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তোমাদের পূর্বপুরুষদের বিদ্রোহ একটি স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা।

প্রমীলা মার্ডি : এজন্য আমরা আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি ঐ বিদ্রোহের নায়ক দুই ভাইকে।

আবির : যাই বল, তোমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সামাজিক-জীবন, সংস্কৃতি সবই বৈচিত্র্যপূর্ণ।

ক. সাঁওতাল ভাষায় বিদ্রোহকে কী বলে? ১

খ. বীরসা মুন্ডার বিশেষ পরিচয় বর্ণনা কর। ২

গ. আবির কোন বিদ্রোহের ইঙ্গিত দিচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আবিরের শেষোক্ত বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

তৃতীয় অধ্যায়

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা পরিচয়

বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মাতৃভাষা। আর এই ভাষাগুলো পৃথিবীর ৪টি প্রধান ভাষা-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এদেশে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার ধরন ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, ভাষাগুলোর কিছু পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকলেও কিছু কিছু ভাষা আবার পরস্পর ঘনিষ্ঠ। আমাদের সবারই মাতৃভাষা সমান প্রিয়। তাই ভাষা কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, এ দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা কোথা থেকে এল, কোন পরিবারের ভাষা, অনেক আগে এটি কেমন ছিল, এসব প্রশ্নের উত্তর জানার জন্যই এই অধ্যায়।

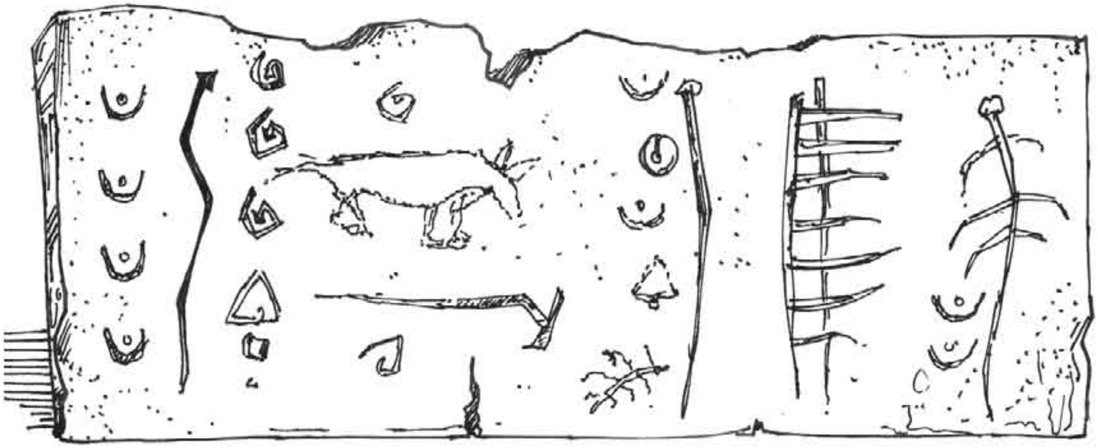

চিত্র- ৩.১ : প্রাচীন লিপি

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- ভাষা সৃষ্টির ইতিহাস এবং ভাষার ধারণা ও উৎস বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও ভাষা পরিবারের নাম উল্লেখ করতে পারব।
- অস্ট্রো-এশিয়াটিক, চীনা-তিব্বতি, ইন্দো-আর্যীয় এবং দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের চিহ্নিত করতে পারব।
- বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা-পরিবারের একটি অঞ্চলভিত্তিক ছক তৈরি করতে পারব।
- বাংলাদেশের মানচিত্রে চিহ্নিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা-পরিবারের রূপরেখা বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন ভাষা-পরিবারের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ- ০১ : বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ভাষা ও ভাষা পরিবার

ভাষা মানুষের এক অনন্য সাংস্কৃতিক অর্জন। ভাষার মাধ্যমে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে। তবে আদিকালে মানুষ আমাদের মতো এত সুন্দর করে ভাষার ব্যবহার শেখেনি। তারা তখন ইঙ্গিত বা ইশারার মাধ্যমে তাদের মনের কথা বা ভাব প্রকাশ করত। আসলে এভাবেই একসময় মুখ থেকে উচ্চারিত ধ্বনিগুলোকে অর্থপূর্ণভাবে সাজিয়ে ভাষার সৃষ্টি হয়। ভাষার এই সৃষ্টি কিন্তু একদিনে হয়নি। হাজার হাজার বছরের পরিবর্তন এবং মানব সভ্যতার বিকাশের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ভাষার।

ভাষা উৎপত্তির সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলের ও সংস্কৃতির মানুষ বিচিত্র ধরনের ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করেছে। ভাষার এই ভিন্নতাই ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন 'ভাষা পরিবার' ধারণার জন্ম দিয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর জীবিত ও মৃত অসংখ্য ভাষার মধ্যে কোনো কোনোটির সঙ্গে অন্যগুলোর মিল দেখা যায়। আবার বিপরীত চিত্রও রয়েছে।

বর্তমান পৃথিবীতে কতগুলো ভাষা প্রচলিত রয়েছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা এখনও সম্ভব হয়নি। তবে ভাষাবিজ্ঞানীগণ মনে করেন বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় ছয় হাজার ভাষা প্রচলিত রয়েছে। পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান ভাষাগুলোর একটি সম্পর্ক লক্ষ্য করে ভাষাবিজ্ঞানীরা এদেরকে পরিবারভুক্ত করেছেন। এই ধারায় বাংলা, চাকমা, ইংরেজি, হিন্দি, ফারসি, ফরাসি, নেপালি ইত্যাদি ভাষাগুলো হচ্ছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম, কন্নড় এমনকি সিংহলিও দ্রাবিড় ভাষা বংশের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের খাসি, মুন্ডা, সাঁওতালির মতো ফিলিপাইন, মালয়, নিউজিল্যান্ড, হাওয়াই ফিজি প্রভৃতি দেশে প্রচলিত রয়েছে অষ্ট্রিক ভাষা বংশের শাখা। আমাদের দেশের মারমা, মান্দি, ত্রিপুরা, চাক, খুমি, পাংখো প্রভৃতি; চীন, থাইল্যান্ড, মায়ানমার এবং তিব্বত অঞ্চলের ভাষাসমূহ হচ্ছে তিব্বতি-বার্মা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ভাষা-পরিবার ও পরিবারের ভাষাসমূহ

ভাষা-পরিবার	শাখা	নৃগোষ্ঠীসমূহ
১. অস্ট্রো-এশিয়াটিক	মোন্-খমের	খাসি।
	মুন্ডারি	সাঁওতাল, মুন্ডা ইত্যাদি।
২. চীনা-তিব্বতি	বোড়ো	মান্দি (গারো), ককবরক, কোচ, পলিয়া, রাজবংশী ইত্যাদি।
	কুকি-চীন	মেইতেই, খুমি, বম, খেয়াং, পাংখো, লুসাই, ম্রো ইত্যাদি।
	সাক্-লুইশ	চাক, ঠার বা থেক।
	তিব্বতি-বার্মিজ	মারমা, রাখাইন ইত্যাদি।
৩. দ্রাবিড়		কুঁড়ুখ ও আদি মালতো (বর্তমানে প্রায় লুপ্ত)।
৪. ইন্দো-ইউরোপীয়		বাংলা, চাকমা (তঞ্চঙ্গ্যা), বিষ্ণুপ্রিয়া, সাদরি, হাজং ইত্যাদি।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা-পরিবারের তালিকা তৈরি কর ।

পাঠ- ০২ : বাংলাদেশের ভাষাগত বৈচিত্র্যের মানচিত্র

উৎপত্তির দিক থেকে বিচার করলে অনেক ভাষাই একে অপরের সাথে সংযুক্ত। বিভিন্ন ভাষার মানুষের মধ্যে প্রচুর আদানপ্রদানও দেখা যায়। তারপরও প্রতিটি ভাষা ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে অনন্য ও অতুলনীয়। যে কোনো মানুষের পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো তার মাতৃভাষা। শুধুমাত্র সৃজনশীলতা ও ভাবপ্রকাশের জন্যই ভাষা অপরিহার্য তা নয়, প্রতিটি ভাষাই সাংস্কৃতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে। ভাষাগত আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে আমরা সবাই সমৃদ্ধ হতে পারি ।

বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীরা প্রধানত চারটি ভিন্ন ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, যথা : (১) ইন্দো-ইউরোপীয়, (২) তিব্বতি-বর্মি, (৩) অস্ট্রো-এশিয়াটিক এবং (৪) দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী। এ অঞ্চলের সবচেয়ে পুরনো ভাষা হল অস্ট্রো-এশিয়াটিক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত মুন্ডারি শাখার ভাষাসমূহ। বর্তমানে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমে বসবাসকারী সাঁওতাল, হো, মুন্ডা, মাহ্‌লে এবং সিলেটের খাসি নৃগোষ্ঠীর মানুষ এই অস্ট্রো-এশিয়াটিক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ভাষায় কথা বলে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমে দিনাজপুর, রাজশাহী, ঠাকুরগাঁও, বগুড়া, রংপুর এলাকায় তাই অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর সাঁওতালি ও মুন্ডা ভাষার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিমের ওরাঁও এবং পাহাড়িয়া নৃগোষ্ঠীর কুঁড়ুখ ভাষা মূলত দ্রাবিড় পরিবারভুক্ত। তিব্বতি-বর্মি ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা আসে প্রায় ছয় থেকে আট হাজার বছর আগে। বাংলাদেশের উত্তরের মান্দি (গারো), সিলেটের মেইতেই মণিপুরী ও পাঙ্গান মণিপুরী, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর যেমন মারমা, ত্রিপুরা, খুমি, বম্, ম্রো প্রভৃতি নৃগোষ্ঠীর ভাষা তিব্বতি-বর্মি ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের আর্য জনগোষ্ঠীর আগমন প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। এই পরিবারের অন্তর্গত বাংলা ভাষা-ভাষী লোকেরা বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই বসবাস করে। তবে বাঙালি ছাড়াও চাকমা, সিলেটের বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী এবং উত্তরবঙ্গের সাদরি ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারভুক্ত।

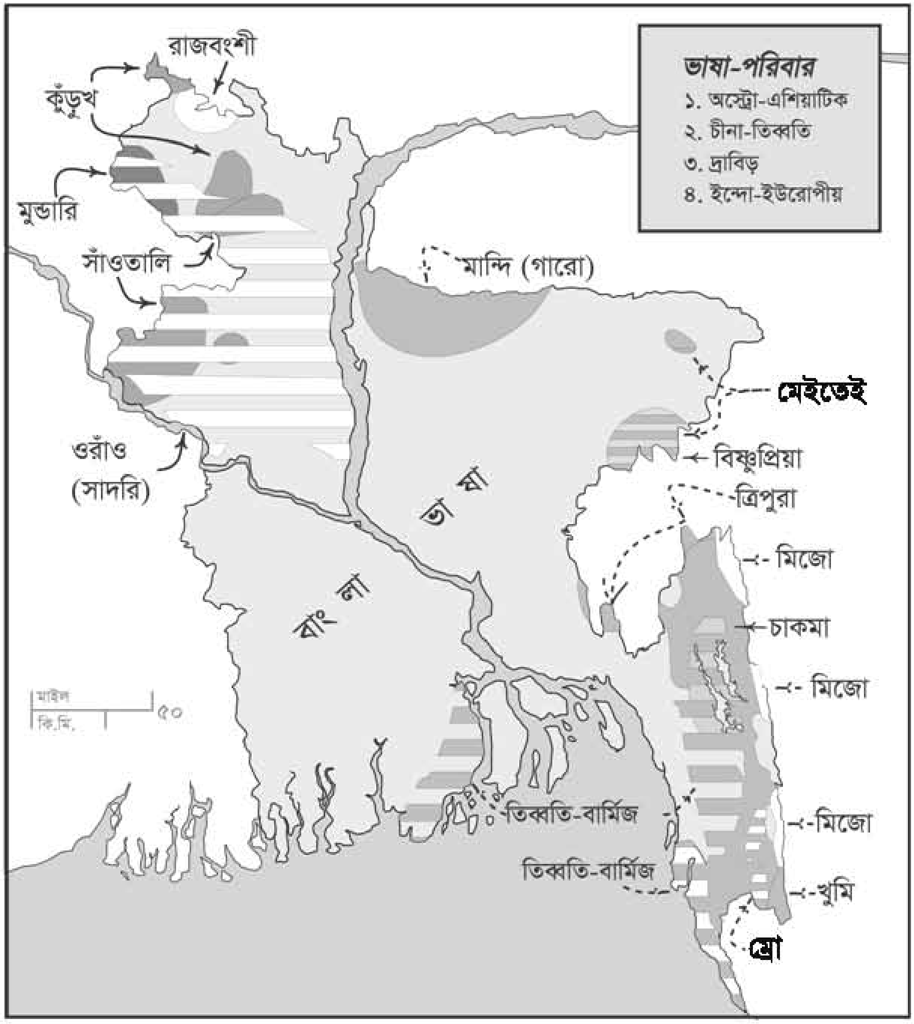

মানচিত্র- ৩.১ : বাংলাদেশের ভাষাগত বৈচিত্র্যের মানচিত্র

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	বাংলাদেশের একটা মানচিত্র আঁক। তারপর সেই মানচিত্রে ভিন্ন ভিন্ন রং ব্যবহার করে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর বসতি চিহ্নিত কর।

পাঠ- ০৩ : অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা পরিবার

পৃথিবীতে অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর জনসংখ্যা কম হলেও বিস্তৃত এলাকা নিয়ে এদের বসবাস। সুদূর আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া থেকে ভারত-চীন পর্যন্ত এ ভাষাগোষ্ঠীর বসবাস। ভাষাবিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের গবেষণায় জানা গেছে বাংলাদেশের আদি বা সর্বপ্রাচীন ভাষা ছিল অস্ট্রিক ভাষা-পরিবারের ভাষা। ভারতবর্ষে প্রচলিত এই ভাষা-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ভাষাসমূহ অস্ট্রো-এশিয়াটিক শাখার ভাষা হিসেবে

পরিচিত। বাংলাদেশে প্রচলিত অষ্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাসমূহ আবার দুটি শাখায় বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে- মোন্-খমের ও মুন্ডারি।

১. মোন্-খমের শাখা : বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় একশটিরও অধিক ভাষা মোন্-খমের শাখার অন্তর্ভুক্ত। এই ভাষাগুলো পূর্ব-ভারত থেকে ভিয়েতনাম, মিয়ানমার, ইন্দোনেশিয়া এবং চীন থেকে মালয়েশিয়া ও আন্দামান সাগরের নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ছড়িয়ে রয়েছে। বাংলাদেশে এই শাখার ভাষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো খাসি ভাষা।

২. মুন্ডারি শাখা : অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানী মুন্ডারি শাখাকে অস্ট্রিক ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মনে করলেও এর ভিন্নমতও রয়েছে। বাংলাদেশে এই শাখার ভাষার মধ্যে রয়েছে মুন্ডা এবং সাঁওতালি ভাষা। এ দুটি ভাষাই এ অঞ্চলের অত্যন্ত প্রাচীন ভাষা।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	পৃথিবীতে অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ কোন কোন দেশে বাস করে?

পাঠ- ০৪ : চীনা-তিব্বতি ভাষা পরিবার

ভাষাবিজ্ঞানীরা চীনা-তিব্বতি (Sino-Tibetan) পরিবারের ভাষাসমূহের বিস্তৃতি মধ্য এশিয়া থেকে দক্ষিণে মিয়ানমার (বার্মা) এবং বালিস্টান থেকে পিকিং (বেইজিং) পর্যন্ত পূর্ব গোলার্ধের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। এই পরিবারে প্রায় দুই থেকে তিনশ ভাষা রয়েছে। ভাষা পরিবারের নাম চীনা-তিব্বতি হলেও এই পরিবারের ভাষাগুলো তিব্বতি-বর্মি (Tibeto-Burman) নামে পরিচিত। ভারতবর্ষে এই ভাষা পরিবার দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি চাইনিজ বা চীনা এবং অন্যটি তিব্বতি-বর্মি। তিব্বতি-বর্মি আবার দুইটি ভাগে বিভক্ত–একটি তিব্বতি- হিমালয়ান ও অপরটি আসাম-বার্মিজ। আসাম-বার্মিজ আবার কয়েকটি শাখায় বিভক্ত। যেমন বোড়ো, নাগা, কুকি-চীন, কাচিন, বার্মিজ ইত্যাদি।

ক. বোড়ো শাখা : বাংলাদেশে মান্দি বা গারো, কক্‌বোরক (ত্রিপুরা), প্রভৃতি ভাষাসমূহ এই শাখার অন্তর্ভুক্ত।

খ. কুকি-চীন শাখা : এই শাখার ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে প্রচলিত আছে মেইতেই মণিপুরী, লুসাই, বম, খ্যাং, খুমি, ম্রো, পাংখো ইত্যাদি।

গ. সাক-লুইশ শাখা : বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার চাক ভাষা এবং বেদেদের ঠার বা ঠেট ভাষা এই শাখার অন্তর্ভুক্ত।

ঘ. তিব্বতী-বার্মিজ শাখা : বাংলাদেশের পার্বত্য জেলার মারমা এবং রাখাইন ভাষা এই শাখাভুক্ত। এই ভাষা অত্যন্ত প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষা।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	পৃথিবীতে চীনা-তিব্বতি পরিবারের ভাষাসমূহের বিস্তৃতি কোন কোন অঞ্চলে?
কাজ- ২ :	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে চীনা-তিব্বতি ভাষা-পরিবারের সদস্য কারা? তাদের নাম লিখ।

২০২০

পাঠ- ০৫ : দ্রাবিড় ভাষা পরিবার

আর্যদের আগমনের বহু পূর্বেই এই দ্রাবিড় ভাষাসমূহ সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশে দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের ভাষাসমূহের মধ্যে কুঁড়ুখ উল্লেখযোগ্য। যদিও পাহাড়িয়া, মালতো প্রভৃতি নৃগোষ্ঠীর মধ্যে একসময়ে দ্রাবিড় ভাষা প্রচলিত ছিল, বর্তমানে তা লুপ্ত এবং তারা সাদরি ভাষা ব্যবহার করে।

কুঁড়ুখ ভাষা : বাংলাদেশে উত্তরবঙ্গের প্রায় সবকটি জেলাতেই একসময় ওরাঁও বা কুঁড়ুখ ভাষা-ভাষীদের বসবাস থাকলেও বর্তমানে শুধুমাত্র রংপুর ও দিনাজপুর জেলাতে কুঁড়ুখ-ভাষী ওরাঁওগণ বাস করে। এছাড়াও সিলেটের চা বাগানে অল্প কিছু ওরাঁও বাস করে। বর্তমানে বাংলাদেশে এদের মোট সংখ্যা প্রায় ২৫,০০০।

কুঁড়ুখ ভাষাটি আদি ও কথ্য ভাষা। এই ভাষার নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। বাংলাদেশের আদিবাসীদের মধ্যে বর্তমানে একমাত্র ওরাঁওরাই দ্রাবিড়ীয় ভাষা বংশের সদস্য।

পাহাড়িয়া ভাষা : বাংলাদেশের রাজশাহী, জয়পুরহাট, দিনাজপুর জেলায় প্রায় ৮০০০ পাহাড়িয়া নৃগোষ্ঠীর লোক বাস করে। পাহাড়িয়া নৃগোষ্ঠীর দুটি শাখা রয়েছে। এদের একটি শাওরিয়া পাহাড়িয়া এবং অন্যটি মাল/ মাড় পাহাড়িয়া। বাংলাদেশে মাল পাহাড়িয়াদের সংখ্যা কম। এদের ভাষাকে মালতো বলা হলেও আসলে মিশ্র ভাষা এবং দীর্ঘদিন বাঙালিদের পাশাপাশি বসবাসের ফলে মূল ভাষা হারিয়ে গেছে।

মাহ্‌লে ভাষা : উত্তরবঙ্গের মাহ্‌লে নৃগোষ্ঠীর ভাষার নাম মাহ্‌লে ভাষা। এদের ভাষার মূল রূপটি বর্তমানে বিলুপ্ত হয়েছে যা দ্রাবিড় ভাষা-পরিবারভুক্ত ছিল। বর্তমানে এদের কথ্য ভাষায় মূল মাহ্‌লে ভাষার শুধু কিছু কিছু শব্দাবলির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। যেমন- দাঃক্ (পানি), ইর (ধান), দাকা (ভাত), ডাংরা (গরু, বলদ) ইত্যাদি।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	দ্রাবিড় পরিবারের ভাষাসমূহের বিস্তৃতির অঞ্চলসমূহের নাম লিখ।

পাঠ- ০৬ : ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার

পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি মানুষের মাতৃভাষা হলো ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারভুক্ত। বাংলাদেশে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারভুক্ত ভাষার মধ্যে বাংলা উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে চাকমা ভাষা এবং ওরাঁওদের ব্যবহৃত সাদরি ভাষা এই পরিবারভুক্ত ভাষা। এছাড়া বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিদের ভাষা এই পরিবারের ভাষা। অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যা ও রাজবংশী ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিরারের অন্তর্গত। ধারণা করা হয় আর্যরা ভারতবর্ষে এই ভাষার প্রবর্তন করেছিল।

প্রায় ৫০০০ বছর আগে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ ভারতবর্ষে এসেছিল। তাদের আগমনের সাথে সাথে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রচলন হয়। ঋগ্বেদ এই ভাষার প্রাচীনতম লিখিত নিদর্শন। ঋগ্বেদের ভাষা তথা বৈদিক ভাষা পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়।

আর এরই আর একটি রূপ কালক্রমে লোকমুখে বিকৃত হতে হতে প্রাকৃত ভাষার রূপ নেয়। লোকমুখে প্রচলিত এই ভাষার নানারূপ পরিবর্তন হতে থাকে এবং তা বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে আসে। এই প্রাকৃত ভাষা থেকেই অপভ্রংশ হয়ে নব্য ভারতীয় ভাষাসমূহের সৃষ্টি হয়। এভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের নানা ভাষার প্রচলন হয়।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিরারের অন্তর্গত বাংলা ভাষা বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত ভাষা। ৮০০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে বাংলা ভাষার উৎপত্তি। মাগধী-প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষা ক্রমে উদ্ভূত হয়েছিল। চর্যাপদ একটি বৌদ্ধ ধর্মীয় পদাবলির সংকলন যা অষ্টম থেকে ১২শ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিল। এই চর্যাপদ বাংলা ভাষার লিখিত রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন। সেই সময়কার বাংলা ভাষা এরপর বহু পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ নিয়েছে। বিভিন্ন সময় ও স্থানভেদে ভাষা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। আর তাই ভাষাকে বহমান নদীর সাথে তুলনা করা হয়।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. নৃগোষ্ঠীর ভাষাগুলো কয়টি ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত?

ক. ৪টি খ. ৬টি

গ. ১২টি ঘ. ১৪টি

২. বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা কতো?

ক. ৫০০০ (প্রায়) খ. ৬০০০ (প্রায়)

গ. ৮০০০ (প্রায়) ঘ. ২৫,০০০ (প্রায়)

৩. ভাষা এক অনন্য সাংস্কৃতিক অর্জন। কারণ এর দ্বারা মানুষের–

i. মনের ভাব প্রকাশ পায়

ii. সুখ-দুঃখ প্রকাশ পায়

iii. নির্ভরশীলতা প্রকাশ পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

এপ্রিলা, শাওরিয়া পাহাড়িয়া নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাশনীম ও মাহ্দী তাদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়। রাতে খেতে বসে এপ্রিলার দাদার সাথে তাদের পরিচয় হয় এবং দাদার অনেক কথাই তারা বুঝতে পারে না।

৪. এপ্রিলার দাদার ভাষার সাথে মিল রয়েছে–

i. কুঁড়ুখ ভাষা

ii. পাহাড়িয়া ভাষা

iii. মাহ্লে ভাষা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও ii

৫. পরিবারটির বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির ভাষা কোন ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত?

ক. দ্রাবিড় খ. অস্ট্রো-এশিয়াটিক

গ. চীনা-তিব্বতি ঘ. ইন্দো-ইউরোপীয়

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.

ছক : ভাষা পরিবারের বিকাশ

ক. মাহ্‌লি ভাষা 'ইর' এর অর্থ কী? ১

খ. ভাষা কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাখ্যা কর? ২

গ. ছকের ভাষা পরিবারকে চিহ্নিত করে এর বিকাশ ধারা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলা ভাষা উপরের ছকে বর্ণিত ভাষা পরিবারের অন্তর্গত বহুল ব্যবহৃত ভাষা-উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২.

সারণি : ১

ক্রমিক নং	প্রবণতা	প্রয়োগকৃত ভাষা
১.	আবেগ	ইস্, আঃ
২.	অনুকরণ	শো শো বাতাস
৩.	স্বাভাবিক প্রবণতা	মারো হেঁইয়ো

ক. 'বোড়ো শাখাটি কোন ভাষা পরিবারের শাখা? ১

খ. 'তিব্বতি-বর্মি' ভাষার ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সারণির ৩নং ক্রমিকে বর্ণিত ভাষার উদ্ভব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ভাষার উদ্ভব নিয়ে সারণির ১নং ক্রমিকের ব্যাখ্যা অপেক্ষা ২নং ক্রমিকের ব্যাখ্যা কি অধিক গ্রহণযোগ্য? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

চতুর্থ অধ্যায়
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রত্নঐতিহ্য

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের বিভিন্ন প্রত্নঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারব এ অধ্যায়ে। কুমিল্লার লালমাই পাহাড়, ময়মনসিংহের মধুপুর গড়, সিলেটের জৈন্তাপুর, হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট, চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় কিছু কিছু প্রত্ন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রাচীন মন্দির ও স্থাপত্য নিদর্শন এবং স্থানীয় রাজন্যবর্গের পুরনো রাজবাড়ি, ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, অলংকার, প্রাচীন মুদ্রা, আসবাবপত্র, সীলমোহর, পুঁথি প্রভৃতি। এই অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রত্নঐতিহ্য এবং তাদের সমৃদ্ধ অতীত ও ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করব।

চিত্র- ৪.১ : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্থাপত্য ঐতিহ্য

এ অধ্যায়ের পাঠ শেষে আমরা-

- অঞ্চল ভিত্তিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রত্ন স্থাপনাসমূহের পরিচয় বর্ণনা করতে পারব।
- তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত তৈজসপত্র এবং অলংকারাদির বিবরণ দিতে এবং এসব সামগ্রীর বৈচিত্র্যপূর্ণ দিক শনাক্ত করতে সক্ষম হব।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্মীয় উপাসনালয়ের স্থাপত্যশৈলী বর্ণনা করতে পারব।
- তাদের প্রত্ন স্থাপনাসমূহের পরিচিতি এবং অবস্থান জানতে আগ্রহী হব।
- প্রত্ন স্থাপনাসমূহ পরিভ্রমণে উৎসাহী হব।

পাঠ- ০১ : প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য বলতে কী বোঝায়?

আমাদের চারপাশে কতো রকমের মানুষ! কতো বিচিত্র তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও জীবনযাত্রা! আমরা নানাভাবে পৃথিবীর মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করি। আচ্ছা, তোমাদের মনে কি কখনো প্রশ্ন জেগেছে যে আজকের পৃথিবীর মানুষকে আমরা যেমনটা দেখি, তারা কি চিরকাল এমনটা ছিল? কেমন ছিল বহু বহু বছর আগের মানুষ? কি করেই বা তারা আজকের অবস্থায় এলো? এইসব কৌতূহল থেকেই আমরা মানুষের অতীত অবস্থা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হই।

অনেক হারানো সূত্র খুঁজে বের করতে হয় আমাদের অতীত সম্পর্কে জানতে। এই সূত্রগুলো প্রায়শই থাকে অনেক অস্পষ্ট। তখন আমাদের চলতে হয় অনুমানের ভিত্তিতে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে এটা অনেক জটিল ও শ্রমসাধ্য কাজ। তারপরও কিন্তু বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন আমাদের হারানো অতীতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে। অতীতের মানুষ ও তার সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার জন্য বিজ্ঞানীদের প্রধান দুটি সূত্র হলো (১) আদি মানুষের কঙ্কাল, দেহাবশেষ ও জীবাশ্ম বা ফসিল, এবং (২) আদি মানুষের সংস্কৃতির বস্তুগত বা দৃশ্যমান উপাদানসমূহের অবশিষ্টাংশ। প্রাচীন যুগে মানুষসহ অন্য যেসব প্রাণী বাস করতো তাদের দেহাবশেষের উপর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মাটি, খনিজ পদার্থ, ধূলিকণা ইত্যাদি জমে জমে তা পাথরের মতো কঠিন রূপ নেয়, যাকে বলা হয় ফসিল বা জীবাশ্ম। আদি মানুষের কঙ্কাল, দেহাবশেষ বা জীবাশ্ম থেকে তাদের দেহাকৃতি, শারীরিক গড়ন, রোগ-বালাই, মৃত্যুর কারণ, খাদ্যাভ্যাস, জিনগত বৈশিষ্ট্য কিংবা তাদের বসবাসের পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

আমাদের অতীত সম্পর্কে জানার দ্বিতীয় সূত্রটি হলো মানব সংস্কৃতির বস্তুগত বা দৃশ্যমান উপাদানসমূহ। প্রাচীন মানুষের ব্যবহৃত তৈজসপত্র, হাতিয়ার এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির অনেক কিছুই সময়ের সাথে সহজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। পাথর কিংবা বিভিন্ন ধাতু নির্মিত অনেক জিনিসপত্র তো লক্ষ লক্ষ বছরেও অবিকৃত থেকে যায়। মাটির নিচে চাপাপড়া অবস্থায় অথবা প্রাচীন গুহার ভিতর থেকে আদি মানুষের ব্যবহৃত এমন অনেক সাংস্কৃতিক নিদর্শনই খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন গুহাচিত্র থেকে শুরু করে আদি মানুষের ব্যবহৃত সকল জিনিসপত্র থেকেই আমরা তখনকার মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনুমান করতে পারি। এরপর মানুষ যখন ধীরে ধীরে তাদের ভাষার লিখিত রূপ আবিষ্কার করে এবং বর্ণমালা ব্যবহার শুরু করে তখন থেকে মানুষের ইতিহাসও আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে।

মানব সংস্কৃতির দৃশ্যমান বা বস্তুগত উপাদানগুলো থেকে মানুষ সম্পর্কে অধ্যয়ন করে প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রাচীন মানুষের ব্যবহার্য বিভিন্ন বস্তুসামগ্রী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি ছোট্ট পাথরের হাতিয়ার অনেক ধরনের তথ্যের উৎস হতে পারে, কারণ তা মানুষের চিন্তা, শ্রম ও জীবনযাত্রার স্বাক্ষর বহন করে। এ কারণে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা যেকোনো নিদর্শন পেলে বুঝতে চেষ্টা করেন সেটি কোন সময়ের, কীভাবে সেটি তৈরি হলো, কে বা কারা তা বানিয়েছে, কেন বা কি কাজের জন্য বানিয়েছে, কেনইবা এভাবে বানানো হলো। এছাড়া এতে কি উপকরণ ব্যবহার করা হলো, কোথা থেকে কি করে এইসব উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছিল, কী ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল, কতোটা সময় ও শ্রম লেগেছিল এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে থাকেন। এভাবে তাঁরা ক্রমশ প্রাচীন মানুষের খাদ্যাভ্যাস, প্রযুক্তিজ্ঞান, হাতিয়ার, তৈজসপত্র ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে থাকেন। আর সেই সাথে নানাধরনের যুক্তি-প্রমাণ ও তথ্য বিশ্লেষণের ২০২০

মাধ্যমে তাদের সমাজ-ব্যবস্থা, বসতি, উৎপাদন পদ্ধতি, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা তৈরি করেন। এভাবে প্রাচীন ও বর্তমান মানুষের মধ্যে সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা এবং এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের সংস্কৃতির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিয়ে আমাদের পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয় প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান।

প্রত্নতত্ত্বের কর্মপদ্ধতি : সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ধাপে ধাপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁদের সিদ্ধান্তে পৌঁছান। এবার প্রত্ন নিদর্শনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের কিছু প্রাথমিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করছি।

১। প্রত্নতাত্ত্বিক সাইট বা স্থান নির্বাচন : প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল স্থান নির্বাচন। যেসব জায়গার ভূ-প্রকৃতি, তার আশেপাশের পরিবেশ ও ছোট-খাটো নিদর্শন বিশ্লেষণ করে মনে হতে পারে যে এখানে আরো নিদর্শন পাওয়া সম্ভব, সেরকম জায়গাকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা গবেষণা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করেন। একে বলা হয় প্রত্নতাত্ত্বিক সাইট। অনেক সময় হঠাৎ পাওয়া কোনো নিদর্শন বা নমুনা দেখে মনে হতে পারে যে এখানে অনুসন্ধান করলে বা মাটি খনন করলে আরো অনেক নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সবসময় এমনটা ঘটে না। তখন ভালো করে জরিপ করে সাইট নির্বাচন করতে হয়।

২। বিভিন্ন নমুনা ও নিদর্শন সংগ্রহ : এই ধাপে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সাইট থেকে নানা প্রত্ন নিদর্শন, প্রত্ন বস্তু বা প্রত্ন স্থাপনা ইত্যাদির নমুনা সংগ্রহ করেন। এধরনের কাজে প্রত্নতাত্ত্বিক ও তাঁদের সহযোগীদের বড় দল খনন কাজ ও বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করতে থাকেন। এরপর গবেষণাগারে নমুনাগুলো পরীক্ষা করে সেগুলোর বয়স নির্ধারণ করেন।

৩। লিপিবদ্ধকরণ : সংগৃহীত নিদর্শন ও সূত্রগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা প্রত্নতাত্ত্বিকের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিভিন্ন নমুনা ও সূত্র মিলিয়ে তুলনামূলক আলোচনা ও সময়কাল নির্ধারণ করার জন্য এই বিবরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪। ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ : এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। সব প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত, নমুনা, নিদর্শন ও সূত্র বিশ্লেষণ করে প্রত্নতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এজন্য তারা বিশ্লেষণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করেন : (ক) ঐ নির্দিষ্ট এলাকার প্রাচীন মানুষের জীবনযাত্রা বা সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা, (খ) পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা এবং (গ) মানব সংস্কৃতির বিকাশ ও পরিবর্তনের ধারা নির্ধারণ।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রত্নঐতিহ্য আলোচনার মাধ্যমে আমরা কী কী বিষয়ে ধারণা লাভ করব?

পাঠ- ০২ : প্রত্নতাত্ত্বিক সময়কাল ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা

এই পৃথিবীর ইতিহাস কিংবা মানবজাতির উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে হলে আমাদের অতীতের বিভিন্ন সময়কাল সম্পর্কে কিছু সাধারণ ধারণা প্রয়োজন। এ জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অতীতের সময়কে কয়েকভাবে ভাগ করা হয়। পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা ও মানব সংস্কৃতির পরিবর্তন নিয়ে আলোচনার

সুবিধার্থে অতীতের সময়কে বিভিন্ন সময়কাল, পর্যায় ও যুগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। এর মধ্য দিয়ে আমরা ধারাবাহিকভাবে অতীতের বিভিন্ন পর্যায়ের ভূপ্রাকৃতিক, মানুষের শারীরিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। এধরনের তিনটি সময়কাল নিম্নের সারণিতে দেওয়া হলো :

মহাজাগতিক সময়কাল	:	বিশ্বব্রহ্মান্ড বা মহাবিশ্বের উৎপত্তি, সৃষ্টি ও পরিবর্তনের ধারা নিয়ে আলোচনার জন্য মহাজাগতিক সময়কালকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা হয়।
ভূতাত্ত্বিক সময়কাল	:	পৃথিবীর উৎপত্তি আজ থেকে প্রায় ৪৫০ কোটি বছর আগে। তখন থেকেই আমাদের পৃথিবীর ভূপ্রকৃতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বসবাসযোগ্য হয়েছে। ভূপ্রকৃতির পরিবর্তনের ধারা ও প্রাণের উৎপত্তি অধ্যয়নের জন্য ৪৫০ কোটি বছরকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করে ভূতাত্ত্বিক সময়কাল নির্ধারণ করা হয়।
মানব সময়কাল	:	মানুষের আবির্ভাব, শারীরিক গঠন ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক পরিবর্তন সম্পর্কে জানার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানে অতীতের সময়কালকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে।

এই অধ্যায়ে আমরা মানব সময়কাল নিয়ে আলোচনা করব। মানব সময়কালের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে আলোচনার সময় আমরা এ অধ্যায়ের বিভিন্ন পাঠে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারব।

মানব সময়কালের বিভিন্ন পর্যায় ও সংস্কৃতির বিকাশ : প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানে মানবজাতির ঐতিহাসিক সময়কালকে সাধারণত দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয় : (১) ঐতিহাসিক পর্যায় বা সময়কাল এবং (২) প্রাগৈতিহাসিক পর্যায় বা সময়কাল। ঐতিহাসিক পর্যায় বা সময়কাল বলতে আমরা যে সময় থেকে মানুষের ভাষার লিখিত রূপ বা পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে সেই সময়কালকে বুঝি। বর্ণমালা ও চিত্রলিপির মাধ্যমে লেখার রীতি আবিষ্কারের ফলে অতীতের বিভিন্ন সময়কালের মানুষ তাদের নিজ নিজ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে লিখিত বর্ণনা রেখে গেছেন। সে সব ঐতিহাসিক দলিল থেকে আমরা বিভিন্ন অঞ্চল ও সময়কালের মানুষের ইতিহাস সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে জানতে পারি। যেমন, গুপ্ত সাম্রাজ্য, পাল সাম্রাজ্য কিংবা মুঘল সাম্রাজ্যের সময়কাল নিয়ে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক দলিল রয়েছে। ফলে এই সাম্রাজ্যগুলোর সময়কালকে আমরা আলাদাভাবে আলোচনা করতে পারি এবং সমসাময়িক কালের অন্যান্য সাম্রাজ্যের সাথে তাদের অবস্থার তুলনা করতে পারি।

ভাষার লিখিত রূপ আবিষ্কারের পূর্বের মানুষদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেকটাই অনুমাননির্ভর। প্রাগৈতিহাসিক সময়কাল বলতে সাধারণত লিখিত ভাষা আবিষ্কারের পূর্বের সময়কেই বোঝানো হয়ে থাকে। প্রাগৈতিহাসিক সময়কালের আদি মানুষ সর্বপ্রথম পাথরের ব্যবহার, অর্থাৎ পাথর দিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র বানানোর কৌশল আবিষ্কার করে। এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধাতব পদার্থ যেমন ব্রোঞ্জ, তামা ও লোহার ব্যবহার উদ্ভাবন করে। মানুষের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, দ্রব্যাদি ও প্রযুক্তির ধরনের উপর ভিত্তি করে প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানে প্রাগৈতিহাসিক সময়কালকে তিন পর্যায় বা যুগে ভাগ করা হয় : (১) পাথর যুগ, (২) ব্রোঞ্জ ও তাম্র যুগ এবং (৩) লৌহ যুগ। প্রযুক্তির বিকাশ পৃথিবীর সব অঞ্চলে একই সময়ে বা একই ধারায় হয়নি। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এই তিনটি যুগের সময়কালে পার্থক্য রয়েছে।

(১) পাথর বা প্রস্তর যুগ (Stone Age) : প্রাগৈতিহাসিক সময়কালের সবচেয়ে আদি যুগের নাম প্রস্তর যুগ (Stone Age)। এই যুগ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। এই পর্যায়গুলোতে সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলো।

ক) পুরোপলীয় (Palaeolithic) : এ সময়ে মানুষ আগুনের ব্যবহার শেখে। এছাড়াও ছিল পাথর ও হাড়ের তৈরি জিনিসপত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি যেমন, ধারালো পাথর, কাটারি, হাত কুঠার, বর্শা ইত্যাদি। এসবের সাহায্যে মানুষ বন-জঙ্গল হতে শিকার ও ফলমূল সংগ্রহ করে তাদের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা মেটাত। সাধারণত ২৫ থেকে ১০০ জনের একটি দল যাযাবর জীবনযাপন করত। পরবর্তীতে তারা নদী বা হ্রদের কাছে গুহা বা ছোট কুটির তৈরি করে বসবাস করত।

খ) মধ্যপলীয় (Mesolithic) : শিকার করতে বর্শা, তীর-ধনুক এবং মাছ শিকারের জন্য হারপুন, ঝুড়ি বা খাঁচা এবং নৌকার ব্যবহার আবিষ্কার করে মানুষ। শিকার ও সংগ্রহের পাশাপাশি বন্য শস্যের বীজ সংগ্রহ করা এবং বন্য পশু পোষ মানানোর প্রচেষ্টা করে। অতিপ্রাকৃত শক্তি ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করত মানুষ এবং মৃতদেহ সৎকারের আচার অনুষ্ঠান পালন করত।

গ) নব্যপ্রস্তর (Neolithic) : পাথরের তৈরি মসৃণ দ্রব্যাদি, হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হত কৃষি কাজ এবং আত্মরক্ষার জন্য, যেমন- কাস্তে, বাটালী, নিড়ানী, লাঙ্গল, জোয়াল, মৃৎপাত্র ইত্যাদি। সেইসাথে মানুষ পশু ও মৎস্য শিকার এবং খাদ্য সংগ্রহ করত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তার জন্য স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস শুরু করে। মানব সমাজে পূর্বপুরুষ পূজা ও বহু আত্মার ধারণার বিকাশ ঘটে এবং শামান (ধর্মীয় ওঝা) এবং তার সহযোগীদের আবির্ভাব ঘটে।

(২) ব্রোঞ্জ ও তাম্র যুগ (Bronze Age) : এ যুগের শুরুতে তামা নির্মিত এবং পরবর্তীকালে ব্রোঞ্জ নির্মিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র, তাঁত এবং মাটির চাকা আবিষ্কার করে মানুষ। শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং বিভিন্ন পেশাজীবী দলের উদ্ভব হয়। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা শুরু করে মানুষ।

(৩) লৌহ যুগ (Iron Age) : লোহার তৈরি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র ব্যবহার শুরু করে মানুষ। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয় এবং রাজধানীর সাথে অন্যান্য শহরের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান হয় এই সময়ে।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সময়কালের নাম লিপিবদ্ধ কর।
কাজ- ২ :	প্রাগৈতিহাসিক সময়কালের বিভিন্ন সংস্কৃতির উপাদানের নাম লিখ।

পাঠ- ০৩ : বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বসবাসের ইতিহাস

প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বসবাস। আদি মানুষের ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও নিদর্শন থেকে বাংলাদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। এ ছাড়াও বর্তমানে নৃবিজ্ঞানীরা মানুষের বংশগতির ধারক জিনলিপির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর

মানুষের পূর্বপুরুষদের উৎপত্তি ও আদি যোগসূত্র ব্যাখ্যা করেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা এ অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রত্ন ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করব। মানুষের বংশগতির গবেষণা থেকে জানা যায় বর্তমান মানুষের পূর্ব-পুরুষের বসবাস ছিল আফ্রিকা মহাদেশে। প্রায় ৬০ হাজার বছর আগে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। 'আফ্রিকার শিং' বলে পরিচিত বর্তমানের ইথিওপিয়া, সোমালিয়া ও জিবুতি দেশের ভিতর দিয়ে আদিমানুষ প্রথমে দক্ষিণ আরব অঞ্চলে আসে। সেখান থেকে সৌদি আরব ও ইরাক পাড়ি দিয়ে ইরানে প্রবেশ করে। তারপর সমুদ্রের তীর ধরে তাদের পদযাত্রা এগিয়ে চলে পূর্বদিকে। এভাবে পাকিস্তান ও ভারতের উপকূল পার হয়ে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে আদি মানুষেরা ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে।

চিত্র- ৪.২: পাথর নির্মিত হাতিয়ার

বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে বাংলাদেশ ও এর আশেপাশের অঞ্চলে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষদের যাতায়াত ও বসবাসের প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন নৃবিজ্ঞানীরা। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, ফেনীর ছাগলনাইয়া এবং লালমাই পাহাড়ের চাকলাপুঞ্জি অঞ্চলে উচ্চ পুরোপলীয় যুগের অনেক হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের বয়স আনুমানিক ১৮ হাজার থেকে ২২ হাজার বছর। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ও নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বর এলাকায় নবোপলীয় যুগের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে, যাদের বয়স আনুমানিক পাঁচ হাজার থেকে আট হাজার বছর। এছাড়া আবিষ্কৃত হয়েছে তাম্র ও প্রস্তর যুগের বসতি ও মৃৎপাত্র যাদের আনুমানিক বয়স খ্রিস্টপূর্ব সাড়ে ৫ হাজার থেকে সাড়ে ৪ হাজার বছর। বগুড়ার মহাস্থানগড় এবং সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত উয়ারী-বটেশ্বরের নানা নিদর্শন থেকে বাংলাদেশে নগর সভ্যতা ও বাণিজ্য বিকাশের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বিকাশকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সাত থেকে খ্রিস্টীয় ছয় শতক। প্রথম খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন লেখক ও পর্যটকদের বর্ণনায় প্রাচীন বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়।

চিত্র: পাহাড়িদের ব্যবহৃত মাচান ঘর

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের এই অঞ্চলে বসবাসের সময়কাল প্রাগৈতিহাসিক পর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। অতীতে এ দেশে তাদের সমৃদ্ধ জীবনধারা ও সংস্কৃতি ছিল। তার সাক্ষ্য এখনও বহন করে চলেছে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাদের প্রত্নস্থাপনাসমূহ। সংখ্যায় কম হলেও এসব প্রত্নস্থাপনা তাদের অতীত ইতিহাস, জীবনধারা ও সংস্কৃতিকে জানার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, সিলেট, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শন রয়েছে। এসব স্থাপনার মধ্যে রয়েছে রাজপ্রাসাদ, মন্দির, দুর্গ, পরিখা, পুকুর, কূপ, গুহা স্থাপত্য, স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি। কুমিল্লা অঞ্চলে ত্রিপুরা রাজাদের খননকৃত বেশ কয়েকটি বড় পুকুর ঐ অঞ্চলে একদা তাদের শাসনব্যবস্থার নীরব সাক্ষী হিসেবে আজও বিরাজ করছে।

টেকনাফে রয়েছে বিখ্যাত মাথিনের কূপ। খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলায় বর্তমানে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে ত্রিপুরা রাজাদের খননকৃত দীঘি, যা থেকে ঐ স্থানের নামকরণ দীঘিনালা হয়েছে। একদা মুঘল সেনাপতি বুজুর্গ উমেদ খান কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত রাখাইন জনগোষ্ঠীর দুর্গ আক্রমণ করেছিলেন বলে জানা যায়। আক্রান্ত রাখাইনরা তখন রামু দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন, যা পরে মুঘলরা দখল করে নেয়। এসব দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়ে গেছে।

ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোর প্রত্ননিদর্শনসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টা ছিল সীমিত। ফলে বর্তমানে তাদের বহু প্রত্ননিদর্শন হারিয়ে গেছে। এ ছাড়াও ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ কাজ পরিচালিত হয়নি বলে অনেক কিছুই হয়ত অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। ঔপনিবেশিক শাসনামলের প্রশাসক, পর্যটক, ধর্মযাজক কিংবা স্থানীয় অধিবাসীদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আমরা তাদের বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শনের পরিচয় পাই। এর পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের প্রত্ননিদর্শন সংরক্ষণে কিছু সরকারি উদ্যোগও রয়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদে অবস্থিত জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, তিন পার্বত্য জেলায় অবস্থিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, সমতল অঞ্চলের একাধিক জেলায় অবস্থিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বিষয়ক প্রতিষ্ঠান (বিরিশিরি, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি প্রভৃতি) ও বরেন্দ্র জাদুঘর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। পরবর্তী পাঠগুলোতে আমরা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের কয়েকটি প্রত্নস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করব।

অনুশীলন

কাজ- ১ : বাংলাদেশের প্রত্নঐতিহ্য সংরক্ষনে ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম লিখ।

পাঠ- ০৪ : চাকমা প্রত্নঐতিহ্য ও প্রাচীন রাজবাড়ি

সুদূর অতীতেও চাকমা জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসের অনেক নিদর্শন রয়েছে। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে চাকমা রাজবংশের হাজার বছরের শাসনের নানা মূল্যবান নিদর্শন কালের গর্ভে ইতোমধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রামে এই রাজবংশের শাসনামলের কিছু কিছু নিদর্শন আজও খুঁজে পাওয়া যায়। সেসব নিদর্শনের মধ্যে এখানে চাকমা নৃপতিদের দুটি রাজবাড়ির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এর একটি চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে রাঙ্গুনিয়ার রাজানগরে চাকমাদের প্রাচীন রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ, বড় একটি দীঘি, চারপাশের পরিখা এবং চাকমা রাণী কালিন্দীর শাসনামলে (১৮৪৪-১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ) নির্মিত বৌদ্ধমন্দির রয়েছে।

চিত্র- ৪.৩ : চাকমা রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ

প্রাসাদটির গোড়াপত্তন বহু আগে হলেও এটির সার্বিক উন্নয়ন ও নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয় চাকমা

রাজা জানবক্স খাঁ'র আমলে (শাসনকাল ১৭৮২-১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ)। এই নৃপতি চাকমা রাজ্যের রাজধানী আলিকদম থেকে রাঙ্গুনিয়ায় স্থানান্তরিত করেন এবং এর নাম রাখেন রাজানগর। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে এই রাজবাড়ি এখন প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। ইট-পাথর দিয়ে তৈরি এবং স্থাপত্যশৈলীতে অনন্য এই রাজবাড়ি প্রায় ৫২ একর জায়গাজুড়ে নির্মিত। এর এক-একটি দেয়াল প্রস্থের দিক থেকে তিন ফুটের মতো চওড়া।

মূল দালান ছাড়াও এই রাজপ্রাসাদে ছিল বিশাল রাজদরবার, হাতি-ঘোড়ার পিলখানা, শান বাঁধানো সাগরদীঘি, রাজকর্মচারীদের জন্য নির্মিত অন্যান্য দালান-কোঠা, রাজ-কাছাড়ি, বৌদ্ধ বিহার, মসজিদ, মন্দির প্রভৃতি। ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও ঐতিহাসিক নানা ঘটনাপ্রবাহের জন্য এই রাজপ্রাসাদ আজও বিখ্যাত হয়ে আছে। রাজা হরিশচন্দ্র রায় ১৮৮৩ সালে রাঙ্গুনিয়ার রাজানগর হতে চাকমা রাজ্যের রাজধানী রাঙ্গামাটিতে নিয়ে আসেন।

চিত্র- ৪.৪ : কাপ্তাই হ্রদে তলিয়ে যাওয়া চাকমা রাজপ্রাসাদ

পরবর্তীকালে রাজা ভুবন মোহন রায় রাঙ্গামাটিতে নতুন একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। দ্বিতলবিশিষ্ট এই সুরম্য রাজপ্রাসাদটি চাকমা স্থাপত্যশৈলীর এক অনন্য নিদর্শন। রাজপ্রাসাদের চৌহদ্দীর মধ্যে রয়েছে সুসজ্জিত রাজপুরী, রাজ কাছাড়ি, প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির, রাজভান্ডার, রাজ কর্মচারীদের বাসগৃহ প্রভৃতি। রাজা ভুবন মোহন রায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র রাজা নলিনাক্ষ রায় এই প্রাসাদে ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত রাজকার্য পরিচালনা করেন।

রাজা নলিনাক্ষ রায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ত্রিদিব রায় ১৯৫৩ সালের ২ মার্চ চাকমা জনগোষ্ঠীর ৫০তম রাজা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনামলে ১৯৬০ সালে পাকিস্তান সরকার কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করে। ফলে ঐতিহ্যবাহী চাকমা রাজপ্রাসাদ, বৌদ্ধমন্দির এবং রাজপরিবারের নিজস্ব এক হাজার একর ভু-সম্পত্তিসহ প্রায় ৫৪,০০০ একর কৃষিজমি পানির নিচে তলিয়ে যায় এবং লক্ষাধিক মানুষ উদ্বাস্তু হয়। চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় পরবর্তীকালে রাঙ্গামাটির রাঙ্গাপানি মৌজায় আরেকটি নতুন রাজবাড়ি নির্মাণ করেন।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	উপরের আলোচনা অনুসারে চাকমা রাজবংশের চট্টগ্রাম অঞ্চল শাসনের কিছু নিদর্শনের নাম লিখ।

পাঠ- ০৫ : খাসি প্রত্নঐতিহ্য ও প্রাচীন রাজপ্রাসাদ

সিলেটের জৈন্তাপুর অঞ্চলে খাসি রাজাদের রাজ্য ছিল। সিলেট বিভাগীয় শহর থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তরে জৈন্তিয়া পাহাড়ের পাদদেশে জৈন্তাপুর অবস্থিত। এর উত্তর ও পূর্ব পার্শ্বে রয়েছে বেশ কয়েকটি উঁচু-নীচু পাহাড়ের সারি এবং উপত্যকা, দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বে আছে অসংখ্য হাওর বাঁওড়ে পরিপূর্ণ সমতল ভূমি। এখানে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে আছে জৈন্তিয়া রাজাদের প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। এসব ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রয়েছে রাজার রাজদরবার, পাথরের তৈরি বিশাল বেদী, জৈন্তেশ্বরী মন্দির, সমাধিক্ষেত্র, স্মৃতিফলক আর প্রাচীন পাথরখন্ড দিয়ে তৈরি বাড়িঘরের বড় বড় স্তম্ভ। খ্রিস্টীয় ১৬৮০ সালে জৈন্তিয়া রাজা লক্ষ্মী সিংহ দ্বারা নির্মিত রাজপ্রাসাদটি বর্তমানে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে বলা যায়।

চিত্র- ৪.৫ : জৈন্তাপুরে খাসি রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ

খাসিদের জৈন্তাপুর রাজ্যের প্রাচীন নিদর্শন বৃহত্তর সিলেটের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে পাওয়া গেছে। এসব নিদর্শনের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অংশগুলো হলো রাজদরবার, স্মৃতিসৌধ, মন্দির, পাথরে উৎকীর্ণ ঘোষণাপত্র, বিভিন্ন নক্শা যেমন - ত্রিশুল, পদ্মফুল, ধর্মচক্র, বাসগৃহ প্রভৃতি। অস্ট্রো-এশিয়াটিক জনধারার খাসি জনগোষ্ঠীর সিলেট অঞ্চলে আগমন ঘটে নব্য প্রস্তর যুগের শেষদিকে। বর্তমান ভারতের খাসিয়া পাহাড়ে খ্রিস্টপূর্ব তের শতকের প্রত্ননিদর্শন পাওয়া গেছে। সেই হিসেবে বাংলাদেশের জৈন্তাপুরে আবিষ্কৃত খাসি প্রত্ননিদর্শনগুলোরও যোগসূত্র আছে বলে অনুমান করা যায়।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	জৈন্তাপুর কেন বিখ্যাত?

পাঠ- ০৬ : বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, তৈজসপত্র ও অলংকার

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের নিত্যব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম থেকে তাদের আদি ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, বোমাং ও মং সার্কেলের রাজবাড়ীতে বা তাদের পারিবারিক সংগ্রহশালায় শত শত বছরের পুরনো কিছু প্রত্ননিদর্শন ও ছবি আজও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের

গৌরবময় অতীতের সাক্ষ্য বহন করছে। পুরনো এসব সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে কামান, বন্দুক, তলোয়ার, বল্লম, শিরস্ত্রাণ, ঢাল, বর্ম, তীর, ধনুক, বর্শা, গোলাবারুদ রাখার পাত্র, কুঠার, ছোরা, কুকরী প্রভৃতি যেগুলো মূলত যুদ্ধবিগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হতো। রাঙ্গামাটির চাকমা রাজবাড়ীর বিচারালয়ের পাশে "ফতে খাঁ" নামের একটি কামান আছে। এছাড়া আছে ছোট আকারের আরও দু'টি কামান - 'কুঞ্জধন ও 'কুঞ্জবি'।

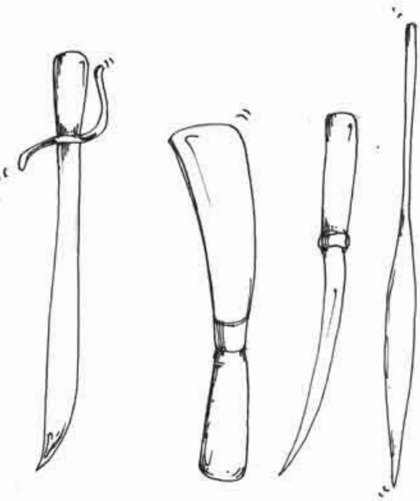

চিত্র- ৪.৭ : বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার

বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ার ছাড়াও অনেক প্রাচীন নিদর্শন রয়েছে রাজাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায়। এর মাঝে রয়েছে প্রাচীন মুদ্রা, পুঁথি, ধর্মগ্রন্থ, সীলমোহর, রাজা বা রাজপুত্রের মুকুট, রাজকীয় পোশাক-পরিচ্ছদ, আকর্ষণীয় বিভিন্ন নকশা আঁকা শতবর্ষের প্রাচীন পালঙ্ক এবং অন্যান্য আসবাবপত্র, স্বর্ণ কিংবা অন্যান্য মূল্যবান ধাতু দিয়ে তৈরি মোহর, রাজকীয় মেডেল, মানপত্র, গহনা, বাদ্যযন্ত্র, সৌখিন নানা তৈজসপত্র, পাথরে উৎকীর্ণ রাজকীয় নির্দেশ বা ঘোষণা, ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতি। এসব প্রত্ননিদর্শন থেকে শত শত বছর আগে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে গারো, খাসি, মণিপুরীসহ সমতল অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজেও এ ধরনের বেশ কিছু প্রত্ননিদর্শন রয়েছে।

চিত্র-৪.৮ : রুপার তৈরি গলার হার ও কানের দুল

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের বসবাস অঞ্চলে প্রাচীন কালের তৈজসপত্র ও অলংকারের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, নব্য প্রস্তর যুগের প্রথমদিকে মানুষ তৈজসপত্র হিসেবে যে নারকেল বা লাউয়ের খোল ব্যবহার করতো বাংলাদেশের কোনো কোনো ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সমাজে হাজার বছরের সেই প্রাচীন তৈজসপত্র আজও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ম্রো, খ্যাং, খুমীসহ অনেক জনগোষ্ঠীর সমাজে লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরি পাত্র এখনও একটি অপরিহার্য তৈজসপত্র। কাঠ, বাঁশ, বেত, হাতির দাঁত, তামা, পিতল, ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি নিজেদের ঐতিহ্যবাহী ডিজাইনের নানা তৈজসপত্র বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো শত শত বছর ধরে ব্যবহার করে আসছে।

২০২০

গৃহস্থালির নানা উপকরণ যেমন - পোশাক-পরিচ্ছদ, পুঁথিপত্র, গহনা ইত্যাদি সংরক্ষণ, মালামাল বহন করা, কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি কাজে এসব তৈজসপত্র ব্যবহৃত হয়। বুনন ও ব্যবহারের দিক থেকে প্রায় ক্ষেত্রে মিল থাকলেও জাতিগোষ্ঠীভেদে কিছু কিছু তৈজসপত্রে যথেষ্ট অমিলও রয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের ব্যবহার্য প্রাচীন কিছু তৈজসপত্র চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, স্থানীয় রাজপরিবারের সংগ্রহশালাসহ অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে। এসব সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে অলংকারের জন্য কারুকার্য খচিত বাক্স, ফুলদানি, প্রদীপদানি, আতরদানি, কলমদানি, পানদানি, পিতলের হুক্কা, হাতির দাঁত ও কাঠের তৈরি চিরুনি, পিঁড়ি, পিতলের তৈরি হাঁড়ি, থালাবাসন এবং ভোজনের জন্য ব্যবহৃত টেবিলসদৃশ অনুচ্চ কাঠামো (চাকমা ভাষায় ভুজংবেড়), কিরিচ বা তলোয়ারের খাপ, কলম, কালি রাখার পাত্র, আয়না, ঝাড়বাতি, মন্দিরের বড় ঘন্টা, কোমর তাঁতের নানা সরঞ্জাম, বিভিন্ন নকশা এঁকে তৈরি কাপড়ের ব্যাগ, লণ্ঠন, তামাকের পাইপ, পাখা, মসলা ইত্যাদি গুঁড়ো করার জন্য ব্যবহৃত পাটা, বাঁশ ও বেতের তৈরি আসবাবসহ নিত্যব্যবহার্য নানা তৈজসপত্র।

চিত্র- ৪.৯ : ঔপনিবেশিক শাসনামলের রুপার মুদ্রা

চিত্র- ৪.১০ : বাঁশের তৈরি বিভিন্ন ধরনের ঝুড়ি

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সমাজে মূলত নারীরা অলংকারের প্রধান ব্যবহারকারী হলেও অল্প কিছু জাতিগোষ্ঠীতে নারী-পুরুষ উভয়েই অলংকার ব্যবহার করে থাকে। নারীরা সচরাচর সোনা, রুপা, তামা প্রভৃতি ধাতু এবং হাতির দাঁত ও শঙ্খের তৈরি অলংকার ব্যবহার করতেন। বিশেষ করে গলার হার তৈরির জন্য মুঘল ও ব্রিটিশ আমলের রুপার মুদ্রা ছিল একটি অপরিহার্য উপাদান। ব্যবহার্য বিভিন্ন অলংকারের মধ্যে ছিল চন্দ্রাহার, খোঁপাবন্ধনী, বাহুবন্ধনী, আংটি, হাত ও পায়ের জন্য চুড়ি, নুপুর, মল, বলয়, কানের দুল, নাকছাবি প্রভৃতি। এসব অলংকার তৈরিতে নিজ নিজ ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ডিজাইন ব্যবহৃত হতো। সে কারণে অলংকার তৈরির উপকরণ এক হলেও জাতিগোষ্ঠীর পছন্দ অনুসারে তাদের নকশায় কখনও কখনও পার্থক্য দেখা যায়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত অলংকারগুলোতে এখনও তাদের নিজ নিজ ঐতিহ্যবাহী নকশার প্রাচীন ধারাটিই লক্ষ্য করা যায়।

কাজ- ১ :	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের নিত্যব্যবহার্য পুরনো যেসব যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, তৈজসপত্র, অলংকার এবং অন্যান্য উপকরণ পাওয়া গিয়েছে টেবিলের সাহায্যে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ- ০৭ ও ০৮ : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের ধর্মীয় উপাসনালয়ের স্থাপত্য ঐতিহ্য

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের নান্দনিক ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ের স্থাপত্যশৈলী থেকে। প্রাচীনকালের রাজা-বাদশা ও সমাজের অভিজাত শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতাতেই ইতিহাসের নানা সময়ে গড়ে উঠেছিল বহু মন্দির, মসজিদ, গির্জা, প্যাগোডা, বিহার এবং অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজেও ধর্মচর্চার বিভিন্ন ধারা, প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় স্থাপনা গড়ে উঠেছে প্রাচীনকাল থেকেই। আমরা এখানে তাদের কয়েকটি প্রাচীন ধর্মীয় স্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করব।

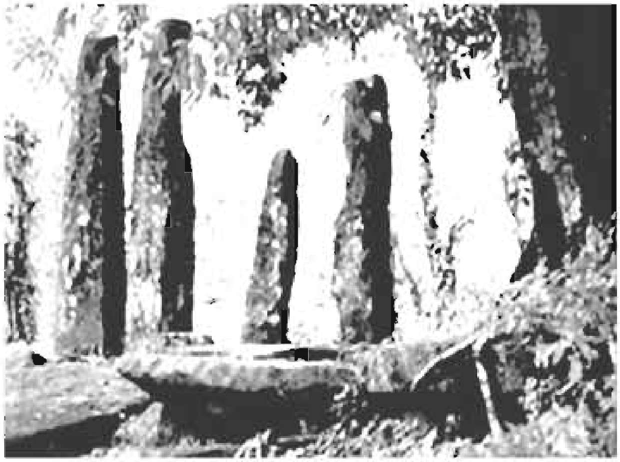

চিত্র- ৪.১১ : পাথর নির্মিত উৎসর্গ বেদী, সিলেট

জৈন্তেশ্বরী মন্দির : ঔপনিবেশিক শাসকদের বিভিন্ন দলিলপত্র, গ্রীক, রোমান এবং চীনা পরিব্রাজকদের নানা বিবরণ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতকে খাসি জনগোষ্ঠীর বসবাস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তবে খাসি নৃগোষ্ঠীর আদি পূর্বপুরুষরা অর্থাৎ খাসি-খমুইক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ বাংলাদেশ ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে বসতি স্থাপন করে আনুমানিক আঠার হাজার বছর পূর্বে। তবে শুধুমাত্র খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আমরা তাদের রাজনৈতিক ইতিহাস লিখিতরূপে পাই। খিস্টীয় পনের শতক থেকে শুরু করে ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ শাসনাধীনে চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত দীর্ঘ শাসনামলে খাসি বা জৈন্তিয়া রাজা-রাণীরা বিভিন্ন সময়ে রাজপ্রাসাদ, স্মৃতিসৌধ, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন। সিলেটের জৈন্তা রাজপ্রাসাদ এবং জৈন্তেশ্বরী মন্দির হলো খাসি জনগোষ্ঠীর গৌরবময় অতীতের স্মৃতিবাহী তেমনই একটি প্রত্নস্থাপনা।

খ্রিস্টীয় ১৬৮০ সালে জৈন্তা রাজা লক্ষ্মী সিংহ জৈন্তেশ্বরী মন্দির, রাজপ্রাসাদ এবং বিশাল সব প্রস্তরখন্ড দিয়ে বেশ কয়েকটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। সংরক্ষণের অভাবে বর্তমানে রাজবাড়িটি পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও মন্দিরের কিছু অংশ এবং পাথরের কয়েকটি স্তম্ভ এখনও টিকে আছে। মন্দির কমপ্লেক্সের সীমানা প্রাচীরের অবস্থা সামান্য ভাল হলেও তার আদি রূপটি আর অবশিষ্ট নেই। এখন দেয়ালগাত্রে আঁকা বিভিন্ন নকশার মধ্যে রয়েছে ঘোড়া, সিংহ এবং পাখাযুক্ত পরীসহ নানা কাল্পনিক বস্তু ও প্রাণীর ছবি।

মন্দির এলাকার চারপাশজুড়ে ছোট বড় মিলিয়ে কমপক্ষে ৪২টি স্থাপনা রয়েছে। এর মধ্যে আছে কয়েকটি স্মৃতিসৌধ এবং এসব স্মৃতিসৌধের ছোট বড় ১৯টি স্তম্ভ বা মেগালিথ। প্রাচীন যুগের প্রকান্ড প্রস্তরখন্ডকে মেগালিথ বলা হয়। মেগালিথের লম্বা বা খাড়া স্তম্ভগুলোকে বলা হয় ‘মেনহির’, আর টেবিলের মতো আয়তাকার স্তম্ভগুলোর নাম ‘ডলমেন’। উভয় ধরনের মেগালিথের সমন্বয়ে জৈন্তাপুরের এই স্মৃতিস্তম্ভগুলো নব্য প্রস্তর যুগে নির্মিত হয়েছিল।

চিত্র- ৪.১২ : রামুতে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার

কক্সবাজারের প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির : রামু কক্সবাজার জেলার একটি উপজেলা এবং প্রাচীন প্রত্নঐতিহ্যের জন্য অন্যতম দর্শনীয় স্থান। এখানে এক বর্গকিলোমিটারের অধিক পাহাড়ি এলাকাজুড়ে বহু প্রাচীন বৌদ্ধ নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। স্থানীয় মাটি ও পাথরের তৈরি কমপক্ষে ২৫টি প্রাচীন বৌদ্ধ মূর্তি এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া এখানকার বিভিন্ন মন্দিরে রয়েছে সোনা, ব্রোঞ্জ এবং অন্যান্য ধাতু দিয়ে তৈরি ছোট বড় ও নানা বর্ণের অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি।

রামুতে যেসব প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে রাংকুট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহার, রামু শিমা বিহার, লামাপাড়া বিহার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মন্দিরগুলোর মধ্যে রাংকুট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহারটি সবচেয়ে প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব ৩০৮ সালে এটি নির্মিত হয়। মন্দিরটির কাছাকাছি নীরবে বয়ে চলেছে বাঘখালী নদী।

আরাকানের রামু রাজবংশের নামানুসারে এলাকাটির নামকরণ রামু হয়েছে। আরাকান রাজ মুলতইং চন্দ্র ৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম অঞ্চল দখল করে নেন। সেই সূত্রে খ্রিস্টীয় ১৬৬৬ সালে চট্টগ্রাম মুঘল শাসনাধীনে চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কক্সবাজার ও রামু অঞ্চলটি আরাকান রাজ্যের অংশ ছিল।

চিত্র- ৪.১৩ : বৌদ্ধ বিহারের প্রাচীন ঘণ্টা

মোঘলদের সময়ে রামুতে তের ফুট উচ্চতার এক বিশাল বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। এটি ব্রোঞ্জের তৈরি এবং বাংলাদেশে এযাবৎ আবিষ্কৃত বুদ্ধমূর্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়।

এই অঞ্চলে আরেকটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের নাম হলো রামু শিমা বিহার। প্রায় চারশ' বছর আগে মূল বিহারটি নির্মিত হয়েছিল। এটি নির্মাণে বিশেষ ধরনের কাঠ এবং ঐতিহ্যবাহী বার্মিজ শৈলী ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন পুঁথিপত্রসহ বর্মী ভাষায় লেখা ত্রিপিটক, ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের বহু বই-পুস্তক রয়েছে এই মন্দিরের পাঠাগারে। এর সামান্য দূরত্বে রয়েছে লামাপাড়া বিহার নামে আরেকটি বৌদ্ধ মন্দির। এখানে ধাতুর তৈরি বিশালাকৃতির প্রাচীন ঘণ্টা রয়েছে। ঘণ্টিতে উৎকীর্ণ দুর্বোধ্য লিপি দিয়ে কিছু লেখা রয়েছে যেগুলোর পাঠোদ্ধার করা এখনও সম্ভব হয়নি। ষোড়শ শতাব্দীতে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

২০২০

এছাড়া আছে কক্সবাজারের সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ মন্দির মাহাসিংদ্রোগী ক্যাং যা ১৬৩৮ সালে নির্মিত হয়। যুদ্ধবিগ্রহ এবং মানুষের সীমাহীন লোভ-লালসা দেখে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ প্রবাসী রাখাইন রাজা উ আগ্গা মেধা (যিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হওয়ার পর এই নাম ধারণ করেন) কক্সবাজারের মাহাসিংদ্রোগী ক্যাংটি নির্মাণ করেন। ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর দ্বারা নির্মিত চিৎমরং নামক প্রাচীন ও দর্শনীয় বৌদ্ধ মঠটির অবস্থান রাঙ্গামাটির কাপ্তাই বাঁধ এলাকা থেকে তিন কিলোমিটার দূরে। এছাড়া রাঙ্গামাটি শহরে অবস্থিত এবং রাজ বনবিহার বৌদ্ধ মন্দিরটি প্রখ্যাত বৌদ্ধ সাধক 'বনভান্তে'র কল্যাণে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এছাড়া ত্রিপুরা রাজপরিবারের কোনো কোনো সদস্যের দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বহুকাল আগে নির্মিত হয়েছিল কয়েকটি হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়। সেগুলোর মধ্যে পানছড়ি উপজেলায় অবস্থিত কালী মন্দির, মাটিরাঙ্গা উপজেলার অযোধ্যা কালী মন্দির, দীঘিনালা উপজেলায় অবস্থিত কামাকুটছড়া শিব মন্দির এবং মাটিরাঙ্গা উপজেলার জুরমরং শিব মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। আনুমানিক দুইশ' থেকে দুইশ' পঞ্চাশ বছর আগে এসব মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

চিত্র- ৪.১৪ : খ্রিস্টপূর্ব ৩০৮ সালে নির্মিত রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহার

অনুশীলন

কাজ- ১ :	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের কিছু বিখ্যাত ধর্মীয় উপাসনালয়ের নাম লিখ।
কাজ- ২ :	কক্সবাজার এবং রাঙ্গামাটি জেলায় অবস্থিত যে কোনো দুটি বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরের অবস্থান চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. মানবজাতির ঐতিহাসিক সময়কালকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

২. ফেনীতে কোন যুগের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে?

ক. পুরোপলীয় খ. মধ্যপলীয়

গ. নবপলীয় ঘ. উচ্চপুরোপলীয়

৩. ব্রোঞ্জ যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো-

i. কৃষিকাজে যন্ত্রপাতির ব্যবহার

ii. ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার

iii. বহু আত্মায় বিশ্বাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪-৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

রোহান তার বন্ধুদের নিয়ে শিক্ষাসফরে নরসিংদীর একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা দেখতে যায়। সেখানে সে খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মাটির পাত্র, পাথরের তৈরি চুড়ি, বালা ইত্যাদি অলংকার দেখতে পায়। সে কৌতূহল ভরে সবকিছু দেখে।

৪. রোহান কোন যুগের প্রত্ন-সামগ্রী দেখতে পায়?

ক. পুরোপলীয় খ. নবপলীয়

গ. তামার ঘ. ব্রোঞ্জ

২০২০

৫. রোহানের দেখা নিদর্শন থেকে তৎকালীন মানব জীবনের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

ক. ধর্মান্ধতা ও মনশক্তি খ. রাজনৈতিক ভাবাদর্শ

গ. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘ. সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১.

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. কোন সময়কে প্রাগৈতিহাসিক সময়কাল বলা হয়? ১

খ. পুরোপলীয় যুগের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ কোন যুগকে নির্দেশ করছে? ঐ যুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. চিত্র-২ এর যুগকে বলা হয় আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি- এ বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২. মা : সীমা, এত মনযোগ দিয়ে তুমি কী কাজ করছ?

সীমা : নারিকেলের খোল দিয়ে ফুলদানি বানাচ্ছি।

মা : বাহ! চমৎকার হয়েছে। তুমি কী জান, লাউ ও নারিকেলের এই খোল দিয়ে পূর্বের মানুষেরা তৈজসপত্র বানাতো। এখনও আমাদের দেশের পাহাড়ি জনপদের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষজন এসব দিয়ে নানা পাত্র তৈরি করে ব্যবহার করছে।

সীমা : ক্ষুদ্র জাতিসত্তার এসব কর্ম নিদর্শন থেকে আমরা তাদের সৃজনশীলতার পরিচয় পাই।

ক. ফসিল বা জীবাশ্ম কী? ১

খ. আমাদের সমাজে লাউ ও নারিকেলের খোলের ব্যবহার বর্ণনা কর। ২

গ. সীমা এবং তার মায়ের বক্তব্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনের কোন দিকটির পরিচয় পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সীমার শেষোক্ত বক্তব্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

পঞ্চম অধ্যায়

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজ জীবন

মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। পরিবার থেকে সমাজ, সেখান থেকে গড়ে ওঠে মানব সভ্যতা। আবার দলবদ্ধ মানুষের সামাজিক জীবনকে যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য গড়ে ওঠে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সমাজব্যবস্থা মূলত আত্মীয়তার সম্পর্কনির্ভর। অর্থাৎ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে সামাজিক কার্যকলাপগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এই অধ্যায়ে আমরা জানতে পারব।

চিত্র- ৫.১ : পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম চাষের দৃশ্য

এ অধ্যায়ের পাঠ শেষে আমরা–

- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজ জীবন বর্ণনা করতে পারব।
- গোত্র বা বংশের ধারণা বর্ণনা করতে পারব।
- মাতৃসূত্রীয় ও পিতৃসূত্রীয় বংশধারার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব এবং উভয় বংশধারার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব।
- বিবাহের ও পরিবারের ধারণা, প্রকারভেদ এবং কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব।
- সমাজ জীবনে পরিবারের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারব।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং এর প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উত্তরাধিকারের ধরন চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ- ০১ : সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি

খাদ্য সংগ্রহ ও বন্য প্রাণীর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করে। দলবদ্ধ মানুষের একই সাংস্কৃতিক জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সমাজ গড়ে ওঠে। সভ্যতার গোড়ার দিকে মানুষ পশু শিকার ও ফলমূল সংগ্রহ করে তার খাবার ও অন্যান্য চাহিদা মেটাতো। তারপর একসময় মানুষ পশুপালন ও কৃষিকাজ করতে শেখে। খাদ্য উৎপাদন করতে শেখার ফলে মানুষের যাযাবর জীবনের অবসান হয়। বিভিন্ন জায়গায় তারা স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে এবং দলের আকারও ক্রমশ বড় হতে থাকে।

মানুষ তার নানা প্রয়োজন মেটানোর জন্যই গড়ে তোলে সমাজব্যবস্থা। দলবদ্ধ মানুষের সামাজিক জীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য গড়ে উঠে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। যেমন, আমাদের পরিবার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এ সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সকল চাহিদা মিটিয়ে থাকে। মানুষের যেকোনো চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানগুলো একে অন্যের কাজে ও দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে। আর তাই যেকোনো সমাজের এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যকার সম্পর্ককে বলা হয় সমাজ কাঠামো।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠে। যেকোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য হলো নিয়ম-নীতি, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সেই প্রতিষ্ঠানের নতুন সদস্যদের পরিচয় করানো। আমাদের পরিবার হলো একটি অন্যতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তাই একেবারে ছোটবেলা থেকেই পরিবার আমাদের আচার-আচরণ, দায়িত্ব, নিয়ম-নীতি ও শৃঙ্খলা প্রভৃতি শিখিয়েছে। শুধু তাই নয়, একটি সন্তানকে সামাজিক অর্থে দায়িত্ববান মানুষ হিসেবে সমাজে চলার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই শিখিয়ে দেয় পরিবার।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আর একটি উদ্দেশ্য হলো তার উৎপাদন, পুনরুৎপাদন, সরবরাহ ও বিতরণের ব্যবস্থা করা। যেমন: পরিবারের একটি বড় উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন। একজন মানুষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে এবং পরবর্তী সময়ে সমাজের নতুন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব নেয়। মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সমাজে তার ভূমিকা ও তার ক্রিয়া-কর্মের পরিবর্তন ঘটে। পরিবারের মতো সব সামাজিক প্রতিষ্ঠানেই এক প্রজন্মের মানুষ বয়স্ক হয়ে অবসর নিলে নতুন প্রজন্মের মানুষ তাদের দায়িত্ব বুঝে নেয়। আর এভাবেই যুগ যুগ ধরে সমাজ টিকে আছে। তাই মানব সমাজের নতুন নতুন সদস্যের উৎপাদন ও সরবরাহ করে থাকে পরিবার।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো তার সদস্যদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন করে দেয়। যেমন, একটি পরিবারের মা-বাবা ও ভাই-বোন প্রত্যেককেই নির্দিষ্ট কিছু অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। এইসব দায়িত্ব ও কর্তব্য বা নিজ নিজ কাজের ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করার মাধ্যমে পরিবারে আমাদের সবার মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় থাকে এবং আমরা মিলেমিশে বসবাস করতে পারি।

সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানই পরিবারের মতো একইভাবে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বণ্টন ও পালনের উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠে। তবে সংস্কৃতিভেদে প্রতিষ্ঠানের গড়ন এবং এর সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিভিন্ন

২০২০

রকমের হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, সিলেট অঞ্চলের খাসি ও বান্দরবানের ম্রোদের সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এ দুটি সংস্কৃতিতে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ধরনে ভিন্নতা রয়েছে। খাসিদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নির্ভর করে পান চাষকে ঘিরে। অন্যদিকে, ম্রোদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে জুম চাষকে কেন্দ্র করে। যেহেতু পান ও জুম চাষের পদ্ধতি আলাদা, তাই এ দুটি সমাজের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের দায়িত্বও আলাদা। একইভাবে এ দুটি সংস্কৃতিতে পরিবারসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ধরনেও বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	পরিবারকে কেন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়?
কাজ- ২ :	সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যের তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ- ০২ : সমাজ কীভাবে সংগঠিত হয়?

ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সক্রিয় সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজ সংগঠিত হয়। আর এই সক্রিয় বা ক্রিয়াশীল সম্পর্কের ধরনকে বলে সামাজিক সংগঠন। এর ক্ষুদ্রতম একক হলো সমাজের যেকোনো দুজন ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক। যেমন, পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক। এই পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ধরন আবার সংস্কৃতিভেদে বিভিন্ন রকম হয়। সাঁওতালদের সংস্কৃতিতে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় পুত্র। একই-ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের সংস্কৃতি অনুযায়ী চাকমা রাজার ছেলে হবে পরবর্তী রাজা। সিলেটের খাসি কিংবা ময়মনসিংহের মান্দিদের মাঝে পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ধরন কিন্তু সম্পূর্ণই আলাদা। সেখানে মেয়ে সন্তানরা মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় কিন্তু ছেলে সন্তানরা কোনো সম্পত্তির মালিক হয় না।

চিত্র- ৫.২ : সমাজ সংগঠনের বিভিন্ন স্তর

একটি ক্ষুদ্র সামাজিক দল হলো সমাজ সংগঠনের দ্বিতীয় স্তর। তিনজন বা এর অধিক ব্যক্তির সম্পর্কের সমন্বয়ে গড়ে উঠে একটি ছোট সামাজিক দল। এ দলের সদস্যরা মিলিত বা যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করে। তাদের মধ্যে সম্পর্কের ধরন ও বন্ধনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রকমের সামাজিক দল দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ পরিবার একটি ছোট সামাজিক দল। নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠে এ পরিবার। পরিবারে সন্তানরা বেড়ে উঠে এবং তার পুরুষ সদস্যরা এক ধরনের দায়িত্ব পালন করে আর মেয়েরা আরেক ধরনের। আবার এ পরিবারে বয়স্ক ও ছোটদের দায়িত্বও আলাদা। তাই বয়স ও নারী-পুরুষ ভেদে পরিবারের সদস্যদের কাজকর্মের মধ্যে এক ধরনের বিভাজন তৈরি হয়। সকল সদস্যের

সুষ্ঠু দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে একটি পরিবার সক্রিয় হয়। তবে এ ক্ষেত্রেও সদস্যদের দায়িত্ব ও কাজকর্মের বিভাজনও সংস্কৃতিনির্ভর।

আত্মীয়তার ভিত্তিতে কয়েকটি পরিবার সম্পর্কযুক্ত হয়ে উঠে। কোনো পরিবারের বিপদে-আপদে বা প্রয়োজনে তার অন্য আত্মীয়-স্বজনরা এগিয়ে আসে। এভাবে দেখা যায়, এক পরিবার অন্য পরিবারকে আত্মীয়তার কারণে সাহায্য ও সহযোগিতা করে। আত্মীয়তার সম্পর্ক সে কারণেই আমাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ। বলা যায়, আত্মীয়তার সম্পর্ক হচ্ছে সামাজিক বন্ধনের মূল। আবার আত্মীয়রা সকলে মিলে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক দল, তথা পরিবারগুলো পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে বৃহত্তর সামাজিক দল গড়ে তোলে। আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে কয়েকটি পরিবার মিলে গঠিত হয় একটি গোষ্ঠী। আর কয়েকটি গোষ্ঠীর সক্রিয়ভাবে একত্রে বসবাসের মধ্য দিয়েই সমাজ সংগঠিত হয়।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সমাজব্যবস্থা মূলত আত্মীয়তার সম্পর্কনির্ভর। অর্থাৎ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে সামাজিক কার্যকলাপ পরিচালিত হয়ে থাকে। সমাজে কোন ব্যক্তির অবস্থান কী, কোথায় সে বসবাস করবে, কারা তার বন্ধু-বান্ধব, কাদের সাথে কোন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে, তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেমন হবে, পরিবার বা সমাজে তার ভূমিকা কী হবে এসব কিছুই আত্মীয়তার সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ সমাজের সকল সম্পর্কই আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠে।

সমাজ সংগঠনের ভিত্তি হিসেবে আত্মীয়তার সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আত্মীয়তার সম্পর্কের মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার এবং সামাজিক দলসমূহের মধ্যে এক ধরনের যোগসূত্র সৃষ্টি হয়। আত্মীয়তার সম্পর্কের মাধ্যমেই উত্তরাধিকারের নিয়ম, বংশধারা গঠন, বিবাহ ব্যবস্থা, পরিবার প্রভৃতি পরিচালিত হয়। আগেই আমরা জেনেছি যে, অনেক সংস্কৃতিতে একজন ছেলে তার পিতার সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে। আবার মান্দি সংস্কৃতিতে একজন মেয়ে সন্তান তার মাতার সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। তাই মান্দি সমাজে মেয়ে সন্তানরা বিয়ের পর একই গ্রাম বা এলাকায় পাশাপাশি বসবাস করে। তাদের ভাইরা অর্থাৎ পরিবারের ছেলে সন্তানরা বিয়ের পর তার শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। অতএব আত্মীয়তার সম্পর্ক ব্যবস্থা বলতে আমরা বুঝি উত্তরাধিকার, বংশধারা, বিবাহ, পরিবার গঠন ও পরিচালনার নিয়মনীতি। তাই বলা যায়, আত্মীয়তার সম্পর্কের মাধ্যমেই মানুষ তাদের নিজ নিজ জীবন পরিচালনা করে থাকে।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	সমাজ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরগুলোর নাম লিখ।
কাজ- ২ :	সামাজিক দল কাকে বলে? সামাজিক দল গঠনের উদ্দেশ্য চিহ্নিত কর।

পাঠ- ০৩ : আত্মীয়তার সম্পর্ক ও তার প্রকারভেদ

আত্মীয়দের মাঝে সম্পর্কই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সমাজের ভিত্তি রচনা করে। আগেই বলা হয়েছে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সমাজ জীবনে আত্মীয়দের মাঝে সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই নির্ধারিত হয় সকল সামাজিক সম্পর্ক। ফলে আত্মীয়তার সম্পর্ক সামাজিক সৌহার্দ্য রচনা করে। তাই আত্মীয়তার সম্পর্ক বিষয়ে জানা গুরুত্বপূর্ণ।

২০২০

আত্মীয়দের মাঝে সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই সমাজে মানুষের ভূমিকা এবং দায়িত্ব ঠিক হয়। ধরে নেয়া যাক আত্মীয়তার সম্পর্কে তুমি কারও ভাই। ছোটবেলা থেকেই তুমি পরিবার থেকে শিখেছ একজন বোন বা ভাইয়ের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার কেমন হবে। তাই তোমাকে কেউ বোন, দিদি, আপু বা ভাই ডাকার সাথে সাথেই তোমার একটি সামাজিক ভূমিকা তৈরি হয়ে যায়। বোন বা ভাই হিসেবে তোমার কাছ থেকে কিছু নির্দিষ্ট আচরণ আশা করা হয়। আবার, স্বাভাবিকভাবেই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে ভাই-বোনের আচরণও আলাদা হয়ে থাকে। যেমন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ম্রোদের সমাজে, একজন ছেলে তার চাচাতো বোনকে নিজের বোনের মতো দেখে, কিন্তু মামাতো বোনকে বিয়ের জন্য হবু কনে হিসেবে বিবেচনা করে। কারণ ম্রোদের সমাজে মামাতো বোনকে বিয়ে করার রীতি প্রচলিত আছে।

সমাজের একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সাথে নানা ধরনের সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে। কিন্তু এসব ধরনের সম্পর্কই সামাজিক কিছু নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। ম্রোদের সমাজের উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, চাচাতো আর মামাতো ভাই-বোনের মধ্যকার সম্পর্ক সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন হতে পারে। আবার মান্দি কিংবা খাসিদের সংস্কৃতিতে ছেলেরা বিয়ের পর কনেদের বাড়িতে থাকতে যায় এবং সেখানে পরিবার গড়ে তোলে। ম্রোদের সমাজ ও তাদের সমাজে বাবা-ছেলে, বাবা-মেয়ে, বাবা-মা, ভাই-বোন, মা-ছেলে ও মা-মেয়ের সম্পর্কসহ অন্যান্য সকল আত্মীয়তার সম্পর্কের পার্থক্য রয়েছে। ফলে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের ভিত্তিতে আচার-ব্যবহার ও দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যেও অনেক পার্থক্য সৃষ্টি হয়। তাহলে বলা যায় যে, মান্দি, খাসি কিংবা ম্রোদের মত অন্যান্য সকল নৃগোষ্ঠীর মধ্যেই সংস্কৃতি পৃথকভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ককে নির্ধারণ করে।

এসো, এবার আমরা আত্মীয়তার সম্পর্কের বিভিন্ন ধরন নিয়ে আলোচনা করি। আমরা সবাই সমাজের অন্য সদস্যদের সাথে নানা ধরনের সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ। আমাদের নিজ নিজ সমাজের সদস্যদের মধ্যে কেউ আমাদের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়, কেউ বন্ধু, আবার কেউবা প্রতিবেশী। রক্ত সম্পর্কের বাইরেও আমাদের আত্মীয় আছে। আমাদের পরিবারের বা আত্মীয়দের বিয়ের মাধ্যমেও অনেকের সাথে আমাদের নতুন আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়। আবার, শুধুমাত্র রক্তের অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই যে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠে, তা নয়, কেউ কেউ আমাদের কাল্পনিক আত্মীয়ও রয়েছে। সুতরাং আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রধানত ৩ প্রকার। যেমন :

১. রক্তের আত্মীয়	রক্ত সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ সম্পর্কগুলোকে রক্তের আত্মীয় বলে। যেমন, একজন ব্যক্তি তার পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, নাতি-নাতনীর সাথে রক্ত সম্পর্কীয় বন্ধনে আবদ্ধ
২. বৈবাহিক আত্মীয়	আমাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে যারা সম্পর্কযুক্ত তাদের বলা হয় বৈবাহিক আত্মীয়। বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে উভয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠে। যেমন, বাঙালি সমাজে একজন পুরুষের সাথে বিবাহের মাধ্যমে একজন নারী তার স্বামীর পরিবারের অন্যদের সাথে চাচি, মামী, ভাবি ইত্যাদি সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। এ ধরনের আত্মীয়দের কুটুমও বলা হয়ে থাকে।
৩. কাল্পনিক আত্মীয়	রক্ত বা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ নয় এমন অনেক ব্যক্তিদের সাথেও আমরা রক্ত বা বৈবাহিক জ্ঞাতিদের মতো আচরণ করি। যেমন, বাবার বন্ধুকে আমরা চাচা ডাকি, কিংবা মায়ের

২০২০

বান্ধবীকে খালা ডাকি। আবার হয়ত আমাদের থেকে বয়সে বড় কাউকে ভাই বা আপু বা দিদি ডাকি এবং সে অনুযায়ী আচরণ করি। এ ধরনের সম্পর্ককে বলে কাল্পনিক বা পাতানো সম্পর্ক।

পরবর্তী পাঠগুলোতে আমরা শিখব সংস্কৃতি কীভাবে আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে। এক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানীরা আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি ও বিস্তারের ক্ষেত্রে দুটি প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন। যার প্রথমটি হলো বিবাহ প্রথাভিত্তিক এবং দ্বিতীয়টি হলো বংশধারানির্ভর।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	আত্মীয়তার সম্পর্কের ধরন উল্লেখ কর।
কাজ- ২ :	রক্তসম্পর্কীয় এবং বৈবাহিক সূত্রে তোমার আত্মীয় কারা? দুটি করে উদাহরণ দাও। তোমার কি কোনো কাল্পনিক আত্মীয় আছে?

পাঠ- ০৪ : আত্মীয়তার সম্পর্ক অধ্যয়নের গুরুত্ব

মানুষকে দলবদ্ধভাবে সমাজে বসবাসের প্রেরণা দেয় আত্মীয়তার সম্পর্ক। পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের ছেড়ে দূরে কোথাও গেলে বেশি দিন একা থাকতে আমাদের ভাল লাগে না। অর্থাৎ আমাদের বাবা, মা, ভাই-বোনসহ অন্য আত্মীয়দের মাধ্যমেই আমরা আমাদের আপন ঠিকানা গড়ে তুলি এবং আমাদের সমাজের সাথে যুক্ত থাকি। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সমাজে আত্মীয়তার সম্পর্কের গুরুত্ব অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত।

আত্মীয়তার সম্পর্কের মাধ্যমে কোনো সমাজের সামাজিক কাঠামো বা সামাজিক সংগঠনগুলো গড়ে উঠে। তাই আত্মীয়তার সম্পর্ক বিষয়ে জানার মাধ্যমে কোনো সমাজের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়। সমাজ সংগঠনের মূল হচ্ছে সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। আর এই পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক। সমাজের সকলেই রক্ত সম্পর্ক অথবা বৈবাহিক সম্পর্ক অথবা কাল্পনিক সম্পর্কের মাধ্যমে একে অন্যের নৈকট্য অনুভব করে থাকে। যেমন : সমাজের সংগঠন হিসেবে পরিবারকে বিশ্লেষণ করতে গেলে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়া কোনোভাবেই বুঝা সম্ভব নয়। আত্মীয়তার সম্পর্কের মাধ্যমেই কোনো সমাজের পরিবার কাঠামো, বিবাহব্যবস্থা, সম্পত্তির মালিকানা এবং উত্তরাধিকার ব্যবস্থা গড়ে উঠে। এর মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি তথা, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং ভাই-বোন সম্পর্ক গড়ে উঠে। আত্মীয়তার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে আত্মীয়তার দলগুলোর মধ্যে বন্ধন তৈরি হয় এবং এর ভিত্তিতে সামাজিক সংহতি ও ঐক্য গড়ে উঠে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, নেতৃত্ব এবং সদস্যদের মাঝে বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রেও আত্মীয়তার সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ জনগোষ্ঠী নিজেদের গোষ্ঠী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। নিজস্ব গোষ্ঠীর মর্যাদা ও স্বার্থ রক্ষায় তারা তৎপর থাকে। ফলে তারা নিজেদের ঐতিহ্য সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তাই সামাজিক উন্নতি এবং অগ্রগতি সাধনে আত্মীয়তার সম্পর্কের গুরুত্ব অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে আত্মীয়তার সম্পর্কই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংগঠন। আত্মীয়তার দলগুলোর ভিত্তিতে এ ধরনের সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন, নানাবিধ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠিত ও সক্রিয় হয়। আত্মীয়তার সম্পর্কের এরকম কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হচ্ছে :

১. সমাজে বিবাহব্যবস্থাকে সংগঠিত করে বিভিন্ন বংশ ও গোত্রের মাঝে বন্ধন সৃষ্টি করা। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সমাজে আত্মীয়তার সম্পর্কভিত্তিক কিছু নিয়মের মাধ্যমে বিয়ের পাত্র-পাত্রী বাছাই করা হয়। ফলে সকল সামাজিক দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় এবং সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠে।

২. এর ভিত্তিতে নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও উদ্দেশ্য নিয়ে পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠে। সমাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য শিশুর জন্মদান ও সংস্কৃতি শিখিয়ে শিশুকে শারীরিক ও মানসিকভাবে গড়ে তোলে সমাজের নতুন সদস্য হিসেবে।

৩. রাজনৈতিক কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্য বিভিন্ন সামাজিক দলের মাঝে বন্ধন তৈরি করে এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধ নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. সম্পদের উত্তরাধিকার ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে সংগঠিত করে সমাজের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখে। বিভিন্ন সম্পদের উপর মানুষের অধিকার নিশ্চিত করে। অর্থাৎ মানুষের অবর্তমানে তার সম্পত্তি কে কতোটা পাবে এবং কীভাবে, সেই বিষয়টি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫. পরিবার ও আত্মীয়তার দলগুলো ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার ও নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে শিশুদের গড়ে তোলে।

৬. সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে একজনের সাথে অন্যজনের আচরণ এবং পারস্পরিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	আত্মীয়তার সম্পর্ক পাঠ করা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

পাঠ- ০৫ : আত্মীয়তার সম্পর্কের পদসমূহ

আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই মানুষের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও সামাজিক জীবন গড়ে উঠে। সংস্কৃতিভেদে আত্মীয়দের ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকার প্রচলন আছে। এই ডাকের মাধ্যমে আমরা একজন আত্মীয়কে চিহ্নিত করি এবং তার সাথে নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয় করে থাকি। সংস্কৃতিভেদে আত্মীয়দের বোঝানোর জন্য কতগুলো নির্দিষ্ট পদ রয়েছে। এগুলোকে আত্মীয়তার সম্পর্কের পদমালা বলা হয়।

আত্মীয়দের মধ্যে যাকে আমরা যে নামে ডাকি তার সাথে আমাদের আচরণও সে রকম হয়। ডাকের ভিত্তিতে কারও সাথে আমাদের সম্পর্ক হয় বন্ধুত্বপূর্ণ বা কারো সাথে ঠাট্টার আবার কাউকে হয়ত আমরা এড়িয়ে চলতে পছন্দ করি। যেমন, বাঙালিদের সংস্কৃতিতে কাউকে দুলাভাই ডাকা হলে তার সাথে সম্পর্কটাও হয় ঠাট্টার। একই সংস্কৃতিতে যখন কাউকে চাচা ডাকা হয়, তখন তার সাথে দুলাভাইয়ের মতো আচরণ

করা হয় না। কারণ সম্পর্কের দিক থেকে চাচা হলেন মুরুব্বি এবং চাচার সাথে ভাতিজার সম্পর্কটাও স্নেহ ও শাসনের। আবার মামার সাথে ভাগিনার সম্পর্কও অনেক মধুর ও বন্ধুত্বপূর্ণ। চাচা ও মামার সাথে আচরণ বাঙালিদের থেকে মান্দিদের মাঝে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। মান্দিদের মাঝে চাচার সাথে সম্পর্ক হয় বন্ধুত্বপূর্ণ এবং মামার সাথে সম্পর্ক হয় স্নেহ ও শাসনের। আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের ম্রোদের সমাজে যেকোনো ছেলে তার শ্বশুর ও শ্বশুর পক্ষের আত্মীয়দের এড়িয়ে চলে। কেননা, এই সমাজে শ্বশুর ও শ্বশুর পক্ষের আত্মীয়দের সবাইকে একসাথে 'তুতমা' বলা হয় এবং 'তুতমা'-দের সামাজিক মর্যাদা জামাই পক্ষের চেয়ে অনেক বেশি। আত্মীয়তার সম্পর্কের এই পদগুলো দিয়ে আসলে আমরা তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কি সেটা চিহ্নিত করি এবং তাদের সাথে আমাদের আচরণের ধরন কি সেটাও বুঝি। তাই আত্মীয়দের ডাকার জন্য ব্যবহৃত পদ বা নাম থেকে আমাদের আপন ও দূরের সম্পর্ক এবং সেই আত্মীয়ের সামাজিক গুরুত্ব বুঝতে পারি।

আত্মীয়তার পদমালা সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে, যথা : (১) শ্রেণিকৃত এবং (২) বিস্তারিত।

(১) শ্রেণিকৃত পদমালা	এ ব্যবস্থায় একটি পদ বা নাম দিয়ে কয়েক ধরনের আত্মীয়কে বোঝানো হয়। যেমন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ম্রোদের সমাজে 'নায়' পদটি দিয়ে খালাতো, ফুপাতো ও মামাতো ভাইদের বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু নিজ গোত্রের সদস্য বলে চাচাতো ভাইকে 'ঈ' বা 'নাওপা' নামে ডাকা হয়। সুতরাং, 'নায়' একটি শ্রেণিকৃত পদ। ইংরেজি 'কাজিন' পদটিও একটি শ্রেণিকৃত পদ।
(২) বিস্তারিত পদমালা	এ ধরনের পদমালায় প্রত্যেক আত্মীয়ের জন্য আলাদা আলাদা নাম থাকে। বাঙালি সংস্কৃতিতে মামাতো, চাচাতো, খালাতো, ফুপাতো ভাই বা বোন বলতে আলাদা ও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝানো হয়।

আত্মীয়তার সম্পর্কের পদমালার ভিত্তিতে দেখা যায় আত্মীয়দের কয়েকটা শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। তবে এ শ্রেণিভাগ সংস্কৃতির নিয়ম অনুসারেই করা হয়ে থাকে। তদনুযায়ী আত্মীয়দের নির্দিষ্ট নামে ডাকার জন্য শ্রেণিভাগ করার কয়েকটি সাংস্কৃতিক নিয়ম নিম্নে উল্লেখ করা হলো –

পূর্বের ও পরের প্রজন্মের ভিত্তিতে	আত্মীয়তার সম্পর্কের পদমালায় পূর্বের প্রজন্মের সাথে পরের প্রজন্মের আত্মীয়দের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করা হয়। যেমন, বাঙালি সমাজে দাদা-দাদি, নানা-নানি, বাবা-মা, চাচা-চাচি, মামা-মামী, খালা-খালু প্রভৃতি পদ দ্বারা যেকোনো ব্যক্তির আগের প্রজন্মের আত্মীয়দের বোঝানো হয়। আবার ভাগনা-ভাগনি, ভাতিজা-ভাতিজি প্রভৃতি পদ দ্বারা বোঝানো হয় ব্যক্তির পরের প্রজন্মের সদস্য।
নিজ প্রজন্মের ভিত্তিতে	বাঙালি সমাজেই আবার ব্যক্তির সমান প্রজন্মের সবাইকে অন্য প্রজন্মের থেকে আলাদা নামে ডাকা হয়। যেমন, চাচাতো ভাইবোন, মামাতো ভাইবোন, ফুপাতো ভাইবোনরা সবাই ব্যক্তির সমান প্রজন্মের।

বয়সের ভিত্তিতে	আত্মীয়দের সাথে আমাদের বয়সের পার্থক্যভেদে আলাদা আলাদা নামে ডাকা হয়। আমার ছোট ভাইকে যেভাবে ডাকি, সেভাবে কিন্তু বড় ভাইকে ডাকি না। ম্রোদের সমাজে নিজ গোত্রের ও নিজ প্রজন্মের সব ছেলেকে ভাইয়ের মত দেখা হয় এবং বয়সে বড় হলে 'ঈ' আর বয়সে ছোট হলে 'নাওপা' ডাকা হয়।
নারী-পুরুষের ভিত্তিতে	আত্মীয়দের মাঝে নারী ও পুরুষদের জন্য রয়েছে আলাদা পদমালা।
রক্তের এবং বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে	বাঙালি সমাজে বাবা, মা, চাচা প্রভৃতি আমাদের রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় কিন্তু ভাবি, চাচি, দুলাভাই ইত্যাদি বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়।
বংশধারার ভিত্তিতে	বাবার ও মায়ের দিকের আত্মীয়দের ডাকের জন্যও আলাদা পদমালা ব্যবহার করা হয়। ম্রোদের সমাজে মায়ের ভাইকে 'পু', বাবার বোনের জামাইকে 'ত্রান্‌গ' এবং বাবার ভাইকে 'পা' পদ দ্বারা বোঝানো হয়।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	আত্মীয়তার পদমালার তালিকা তৈরি কর।
কাজ- ২ :	আত্মীয়তার পদমালার ভিত্তিতে আত্মীয়দের শ্রেনিবিভাগ ছকে উপস্থাপন কর।

পাঠ- ০৬ : বিভিন্ন ধরনের বিবাহব্যবস্থা

মানব সমাজে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয়। পরিবারে শিশুরা প্রতিপালিত হয় এবং সমাজ টিকে থাকে। বিভিন্ন সমাজ তার নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিয়ে সম্পন্ন করে থাকে। আমাদের নিজ নিজ সমাজে বিবাহ প্রথার যে ধরন আমরা দেখতে পাই, তা সর্বত্র একইভাবে প্রচলিত ভাবার কোনো কারণ নেই। কেননা, সংস্কৃতিভেদে বিবাহের ধরন ও প্রক্রিয়া নানা ধরনের হতে পারে।

বিয়ে হচ্ছে সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনের জন্য নারী ও পুরুষের মাঝে এক ধরনের সামাজিক বন্ধন। ধরনে ভিন্নতা থাকলেও সকল সমাজেই বিবাহরীতি বিদ্যমান। বিয়ের বন্ধনের মধ্য দিয়ে একটি পরিবার সূচিত হয়। সেই পরিবারের সকল কাজ সদস্যরা ভাগ করে নেয়। আবার বিয়ের ফলে বর ও কনের পরিবারগুলোর মাধ্যমে দুটি বংশের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিয়ের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পরিবার, বংশ, গোত্র ও অন্যান্য আত্মীয়তার দলগুলোর মধ্যে সম্প্রীতি এবং বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এভাবে অনেক সময় সমাজের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব, বিরোধ বা সংঘাতের অবসান ঘটে। তাই মানুষের সাথে মানুষের বন্ধন দৃঢ় করতে ও মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে বিয়ের গুরুত্ব আমাদের সমাজ জীবনে অপরিসীম।

বিবাহের প্রকারভেদ : সমাজভেদে বিভিন্ন ধরনের বিবাহের প্রচলন থাকলেও এখানে আমরা গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক থেকে বিবাহের ধরন নিয়ে আলোচনা করব। বিবাহের বর ও কনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজে সবচেয়ে প্রচলিত দুটি নিয়ম হলো : (১) বর ও কনের সামাজিক দলের পরিচিতি এবং (২) স্বামী ও স্ত্রীর সংখ্যা।

(১) সামাজিক দলভিত্তিক বিবাহ :

দলের ভিতরে বিবাহ : এ ধরনের বিবাহব্যবস্থায় বর ও কনে নির্বাচন একই সামাজিক দলের মধ্যে হয়ে থাকে। অর্থাৎ একটি বৃহৎ সামাজিক দলের সদস্যরা নিজেদের মাঝে বিয়ে করে। এ প্রথাকে অন্তঃবিবাহও বলা হয়।

দলের বাইরে বিবাহ : একই নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত ছোট ছোট সামাজিক দলগুলো সাধারণত নিজ দলের বাইরে বিয়ে করে। অর্থাৎ, যেকোনো দুটি ছোট সামাজিক দলের মধ্য থেকে বর ও কনে নির্বাচন করা হয়। এ ধরনের বিয়েতে বর- কনে ও তাদের দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে চলা হয়। নিজের দলের বাইরে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বলে এ ধরনের বিয়েকে বহিঃর্বিবাহ বলা হয়। যেমন, প্রায় সব সমাজেই একই পরিবারের সদস্যদের মাঝে বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় দুটি পরিবার কিংবা দুটি বংশের সদস্যদের মাঝে।

(২) স্বামী ও স্ত্রীর সংখ্যাভিত্তিক বিবাহ :

এক বিবাহ : একজন মহিলা এবং একজন পুরুষের মধ্যে যে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলা হয় এক বিবাহ। বর্তমান সময়ের পৃথিবীতে এ ধরনের বিয়ের প্রচলন সবচেয়ে বেশি।

বহু বিবাহ : এ ধরনের বিবাহব্যবস্থায় একজন পুরুষ একাধিক মহিলাকে অথবা একজন মহিলা একাধিক পুরুষকে বিয়ে করে। এ ধরনের সমাজে একাধিক স্বামী বা স্ত্রী নিয়ে পরিবার গঠিত হয়। যেমন, মুসলিম সমাজে একজন পুরুষ একাধিক মহিলাকে বিয়ে করতে দেখা যায়। আবার নেপাল ও তিব্বতের কিছু নৃগোষ্ঠীর সমাজে একজন মহিলার একাধিক স্বামী থাকে। এসব সমাজে পরিবারের সব ক'জন ভাইয়ের সাথে একজন মহিলার বিয়ে হতে পারে।

	অনুশীলন
কাজ- ১ :	আমাদের সমাজ জীবনে বিয়ে কেন গুরুত্বপূর্ণ?
কাজ- ২ :	বিয়ের প্রকারভেদে কী ধরনের ভিন্নতা দেখা যায়? তোমার সমাজে কী ধরনের বিয়ে দেখা যায়?

পাঠ- ০৭ : সামাজিক বিধিনিষেধ ও দলের বাইরে বিবাহের রীতি

সব সমাজেই দেখা যায় বিয়ের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের বিষয়ে কিছু নিয়ম-কানুন আছে। সব সমাজেই কে কাকে বিয়ে করতে পারবে বা কাদের মধ্যে বিয়ের সম্পর্ক তৈরি হতে পারে না সেসব রীতি-নীতি বিদ্যমান। বিয়ে বিষয়ে এসব রীতি-নীতিগুলো অবশ্যই সংস্কৃতিভেদে নানা রকম হয়। এই বিধিনিষেধ আরোপের পিছনে বড় দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমত মানুষ যেন আপন আত্মীয়দের মাঝে বিয়ে না করে। কারণ আপন আত্মীয়দের মাঝে বিয়ে হলে তাদের সন্তানের শারীরিক বা মানসিকভাবে পঙ্গু হবার সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হলো মূলত সামাজিক। বিভিন্ন সামাজিক দলের মাঝে বিয়ের মাধ্যমে নতুন আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করা। কারণ এভাবে মানুষের আত্মীয়তার সম্পর্কের-জাল বিস্তৃত হয় এবং বিভিন্ন সামাজিক দলের মাঝে ঐক্য ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। অবশ্য, প্রথম উদ্দেশ্যটি পালনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটিও সফল হয়।

চিত্র- ৫.৩ : সাঁওতালদের বিবাহের বিধিনিষেধ

মানুষ এল কোথা থেকে? মানবজাতির উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে নানা ধরনের কাহিনী প্রচলিত আছে। মানুষ ও বিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে প্রচলিত এ ধরনের গল্পগুলোকে পুরাণ বলে। সাঁওতালদেরও এমন একটি পুরাণ আছে। এই পুরাণ অনুযায়ী, হাঁস এবং হাঁসী থেকে সাঁওতালদের উৎপত্তি। তাদের আদি পিতা ও মাতা হলেন- পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হি। তাদের ছিল বারটি ছেলে ও বারটি মেয়ে। প্রথমে এই ভাই-বোনদের মাঝেই বিয়ে হয়েছিল। এভাবে বারটি গোত্রের সৃষ্টি হয়, যাদের নাম– হাঁসদা, মার্ডি, মুরমু, বাসকে, হেমরম, বেসরা, সরেন, চড়েঁ, কিসকু, পাউরিয়া, টুডু এবং সোয়ালে। এরপর তাদের আদি পিতা-মাতা সবাইকে ডেকে বললেন, 'ভবিষ্যতে তোমরা আর কোনোদিন ভাই-বোনে বিয়ে দিবে না। আমি তোমাদের বারটি গোত্র দিয়েছি। এখন থেকে তোমরা এক গোত্রের সদস্যদের অন্য গোত্রের সদস্যদের সঙ্গে বিয়ে দিবে।' এভাবে সাঁওতালরা নিজের গোত্রের কোনো সদস্যকে এবং অন্য নৃগোষ্ঠীর কাউকে বিয়ে করে না। এই পুরাণ অনুযায়ী, সাঁওতালদের বিবাহের সামাজিক বিধি-নিষেধসমূহ চিত্র ৫.৩ -এ উপস্থাপন করা হলো। চিত্র অনুসারে সাঁওতালরা বিয়ের বর ও কনে নির্বাচনে তিনটি মূলনীতি অনুসরণ করে :

১। একেবারে ভেতরের বৃত্তটিতে রয়েছে সাঁওতালদের বারটির মধ্যে যে কোনো একটি গোত্র যারা অবশ্যই দলের বাইরে বিয়ে করবে।

২। দ্বিতীয় বৃত্তটিতে রয়েছে সাঁওতালদের বৃহত্তর সমাজ যা মোট বারটি গোত্র নিয়ে গঠিত। সুতরাং যে কোনো একটি গোত্রের সদস্যদের বাকি এগারটি গোত্রের মধ্যে থেকে বর বা কনে নির্বাচন করতে হবে।

৩। তৃতীয় অর্থাৎ বাইরের বৃত্তটিতে রয়েছে সাঁওতালদের প্রতিবেশী অন্য নৃগোষ্ঠীর মানুষরা। কিন্তু অন্য সংস্কৃতির কাউকে বিয়ে করা যাবে না বলে সাঁওতালরা এমন একটি বৃহৎ সামাজিক দল যারা নিজের

দলের ভিতরে বিবাহ সাঁওতালদের মতো অন্য অনেক নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতেও একই গোত্রের, একই বংশের এবং একই পরিবারের সদস্যদের ভিতর বিবাহ নিষিদ্ধ। সংস্কৃতিভেদে বংশ বা গোত্রের বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিবাহ বর্তমান পৃথিবীর প্রায় সব সমাজেই নিষিদ্ধ। অতএব একক পরিবার এমন একটি সামাজিক দল যার সদস্যরা সবসময় দলের বাইরে বিয়ে করে। কেননা, অত্যন্ত আপন আত্মীয়তার বন্ধনে একটি পরিবার গড়ে উঠে। তাই সকল সংস্কৃতির জন্য পরিবার এমন একটি সামাজিক দল যা সবসময় নিজ দলের বাইরে বিবাহ করে।

বিভিন্ন সংস্কৃতিতে, বংশ কিংবা গোত্রকে একটি বড় বা বর্ধিত পরিবারের মতো দেখা হয়। অর্থাৎ, একই বংশ বা গোত্রের ছেলে-মেয়েদের ভাই-বোনের সম্পর্ক গুরুত্ব পায়। তাই তাদের মধ্যে বিবাহ হয় না। সাঁওতালদের মতো মান্দিদের মাঝেও গোত্রের বাইরে বিবাহের নিয়ম প্রচলিত আছে। যেহেতু মান্দি সমাজে বংশধারার নিয়মানুযায়ী সন্তানরা মায়ের বংশের সদস্য বলে বিবেচিত হয় তাই দুই বোনের ছেলে-মেয়েরা একই বংশের হবে ও একই গোত্রের হবে। আর তাই মান্দি সমাজে খালাতো ভাই-বোনের বিয়ে নিষিদ্ধ। মান্দি সমাজে নিজ বংশের এবং নিজ গোত্রের কাউকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। কোনো কোনো নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে নিজেদের গোত্রের এবং বংশের সদস্যদের মধ্যে বিয়ের নিয়ম আছে।

বিয়েকে কেন্দ্র করে একটি নিয়মের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সকল সমাজের মাঝে মিল দেখা যায়, কোনো সমাজেই অন্য সমাজের কাউকে বিয়ে করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয় না। সুতরাং বলা যায় যে, বৃহৎ সামাজিক দল হিসেবে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো নিজ সমাজের ভিতরে বিবাহ করার রীতি অনুসরণ করে। গোত্রের বাইরে বিবাহের মাধ্যমে একই সমাজের বিভিন্ন গোত্রের সদস্যদের মাঝে মৈত্রী বন্ধন ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। আবার নিজ নিজ সমাজের ভিতরে বিবাহের মাধ্যমে এক ধরনের সাংস্কৃতিক সংহতি গড়ে উঠে, যা একটি সমাজকে সুসংবদ্ধ রাখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	বিয়ের ক্ষেত্রে কী ধরনের সামাজিক বিধি-নিষেধ দেখা যায়?
কাজ- ২ :	বিয়ে কীভাবে সামাজিক সংহতি সৃষ্টি করে?

পাঠ- ০৮ : বিবাহ-পরবর্তী বাসস্থানের ধরন

সংস্কৃতিভেদে বিবাহ-পরবর্তী বসবাসের ধরনেরও ভিন্নতা দেখা যায়। যেমন, মান্দি ও খাসি সমাজে বিবাহের পর বর কনের বাড়িতে বসবাস করে। কিন্তু চাকমা বা সাঁওতাল সমাজে বরের বাড়িতে কনে বসবাস করে। সুতরাং আমরা দেখতে পাই, বিবাহের পরে স্বামী-স্ত্রীর বসবাসের ধরন বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে :

বাসস্থানের নাম	বসবাসের ধরন	নৃগোষ্ঠীর উদাহরণ
পিতৃ নিবাস	বিবাহের পরে স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে বসবাস করে।	বাঙালি, চাকমা, মারমাসহ বাংলাদেশের অধিকাংশ নৃগোষ্ঠীর মাঝে এ ব্যবস্থা বিদ্যমান।
মাতৃ নিবাস	বিবাহের পরে একজন স্বামী তার স্ত্রীর বাড়িতে বসবাস করে এবং সেখানেই পরিবার গড়ে তুলে।	মান্দি ও খাসি।
দ্বৈত নিবাস	বিবাহের পরে স্ত্রীর অথবা স্বামীর পিতা-মাতার বাড়ির নিকট নবদম্পতি বসবাস করে।	হোপি (আমেরিকান ইন্ডিয়ান একটি নৃগোষ্ঠী)।
নয়া নিবাস	বিবাহের পরে নবদম্পতি তাদের আত্মীয়-স্বজন হতে আলাদা নিজেদের বাড়িতে বসবাস করে।	আধুনিক ও শিল্পোন্নত সমাজে দেখা যায়।
মাতুলীয় নিবাস	বিবাহের পরে নবদম্পতি বরের মামার সাথে বসবাস করে।	ট্রব্রিয়ান্ড সমাজে (প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে)।

বিবাহ-পরবর্তী বাসস্থানের ধরন প্রত্যেকটি সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। বিবাহ-পরবর্তী বাসস্থান যদি পিতৃ নিবাসীয় হয়, তাহলে বিবাহিত ছেলে তার বাবা-চাচার বংশের আত্মীয়দের সাথে অর্থনৈতিক কাজ যেমন চাষাবাদের কাজ করে। কিন্তু মাতৃ নিবাস হলে বিবাহিত ছেলে তার স্ত্রীর বংশের আত্মীয়দের সাথে চাষাবাদের কাজ করে। বিবাহ-পরবর্তী বাসস্থানের নিয়মের দ্বারা সন্তানেরা কোন ধরনের আত্মীয়দের সাথে ঘনিষ্ঠ হবে এবং কী সামাজিক দায়িত্ব পালন করবে তার অনেকটা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	বিবাহ-পরবর্তী বাসস্থান বলতে কী বোঝায়?
কাজ- ২ :	বিবাহ-পরবর্তী বসবাসের ধরনগুলো কী? তোমার সমাজে বিবাহ পরবর্তী বাসস্থান কী ধরনের হয়ে থাকে?

পাঠ- ০৯ : পরিবার ব্যবস্থা

সামাজিক সংগঠনের সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ একক হচ্ছে পরিবার। এটি হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে প্রাথমিক সামাজিক সংগঠন। বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে পরিবারের সৃষ্টি। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে সন্তান উৎপাদন ও

লালন-পালন করা। পরিবারের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি সমাজে পরিচিতি লাভ করে। সাধারণত পরিবার বলতে বোঝায় একটি সামাজিক গোষ্ঠী। এর সদস্যরা একত্রে বসবাস করার মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলে। সাধারণত একটি ছোট পরিবারে স্বামী-স্ত্রী আর তাদের সন্তানেরা বসবাস করে।

আমাদের জীবনে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। জন্ম থেকেই একটি শিশুকে খাদ্য, চিকিৎসা, নিরাপদ বাসস্থানসহ প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে তোলে তার পরিবার। সমাজের মূল্যবোধ, রীতিনীতি, আদব-কায়দা সব কিছুই পরিবার আমাদের শিখিয়ে দেয়। প্রথম দুটি পাঠে আমরা আলোচনা করেছি পরিবার কীভাবে সমাজের ভিত্তি রচনা করে। এবারে আমরা দেখব সংস্কৃতিভেদে পরিবারের গঠন কী ধরনের হয়ে থাকে।

পরিবারের প্রকারভেদ : সমাজভেদে পরিবারের ধরন ভিন্ন ভিন্ন হয়। তবে আমরা এখানে দুটি বিশেষ দিক থেকে পরিবারের ধরন নিয়ে আলোচনা করব, যথা : (১) পরিবারের গঠনের ভিত্তিতে ও (২) বংশধারার প্রকারের ভিত্তিতে।

(১) গঠনের ভিত্তিতে পরিবার :

পরিবারের প্রকার	পরিবার গঠনের বৈশিষ্ট্য
একক পরিবার	এ ধরনের পরিবারে একটি বিবাহিত দম্পতি এবং তাদের সন্তান-সন্ততিরা বসবাস করে।
বর্ধিত ও যৌথ	একক পরিবার থেকে সদস্য সংখ্যা বেশি থাকে এ ধরনের পরিবারে। বর্ধিত পরিবারে তিন প্রজন্মের মানুষ একত্রে বসবাস করতে পারে। এ ধরনের পরিবারে বাবা-মা ছাড়াও বিবাহিত ভাইরা তাদের স্ত্রী ও সন্তানসহ একত্রে বসবাস করতে পারে। এধরনের পরিবারে অন্যান্য সম্পর্কের আরো আত্মীয়রা বসবাস করতে পারে। বর্ধিত পরিবারে সম্পত্তির মালিকানা একত্রে থাকে এবং আয়-ব্যয় মিলিতভাবে হয়।

(২) বংশধারার প্রকারভিত্তিক পরিবার : বংশধারার নিয়মের উপর ভিত্তি করে পিতৃসূত্রীয় ও মাতৃসূত্রীয় পরিবার দেখা যায়।

পরিবারের প্রকার	পরিবার গঠনের বৈশিষ্ট্য
পিতৃসূত্রীয় পরিবার	এ ধরনের পরিবার গড়ে উঠে যখন বিয়ের পর স্ত্রীরা অন্য বাড়ি থেকে তাদের স্বামীর বাড়িতে বসবাস করতে আসে। উপরের চিত্রের পরিবারগুলোর সদস্যরা পিতৃসূত্রীয় বংশধারার ভিত্তিতে গঠিত। কেননা, এখানে বিবাহিত মেয়েরা অন্য বাড়ি থেকে এসেছে।

মাতৃসূত্রীয় পরিবার	এ ধরনের পরিবারে বিয়ের পর স্বামীরা তাদের স্ত্রীর বাড়িতে এসে বসবাস করা শুরু করে। তাই এসব পরিবারে মেয়ের মা-বাবা, সন্তান ও তার বোনদের নিয়ে গড়ে উঠে। বিবাহিত ভাইরা আর পরিবারের সদস্য থাকে না।

বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের পরিবারব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ময়মনসিংহ অঞ্চলে মান্দিদের পরিবার মাতৃসূত্রীয়। মান্দি পরিবারে সন্তানরা মায়ের পরিচয়ে সমাজে পরিচিত হয়। মান্দিদের মতো সিলেটের খাসি সমাজেও পরিবার ব্যবস্থা একই রকম। এসব সমাজে মহিলারা পরিবার প্রধান হয়। অপরদিকে, বাঙালিসহ অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর সমাজে রয়েছে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। এ ধরনের পরিবারে পুরুষদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	পরিবারের প্রকারভেদ ছকে উপস্থাপন কর।
কাজ- ২ :	পরিবার কীভাবে সমাজের ভিত্তি গঠন করে?

পাঠ- ১০ এবং ১১ : বংশ এবং বংশধারা কী?

বংশধারা : বংশধারা বলতে বংশের বৃত্তান্ত বা ক্রম বা ধারাকে বোঝানো হয়। এক প্রজন্মের সাথে অন্য প্রজন্মের সম্পর্ক ও সম্পর্কের ধারাবাহিকতাকে বংশধারা বলে। অন্য কথায়, পূর্বপুরুষের সাথে আমাদের সম্পর্কের যোগসূত্র নিরূপণ করাকে বংশধারা বলা হয়। অতএব বলা যায়, একজন মানুষ সাধারণত জন্মসূত্রে একটি বংশধারার সদস্যপদ লাভ করে থাকে।

পূর্বপুরুষের সাথে সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে আমরা আপন ও দূরের আত্মীয় নির্ণয় করি। যেমন, একই বাবার দুই ছেলে হলো আপন ভাই। আবার আপন চাচাতো ভাই-বোনরা সবাই একই দাদার বংশধর। এভাবে আমরা যত পেছনের বা পূর্বের প্রজন্মের সূত্র ধরে গণনা করব আমাদের আত্মীয়দের সংখ্যাও তত বাড়তে থাকবে। শুধুমাত্র আমাদের নিকট বা আপন আত্মীয়দের নিয়ে একটি আত্মীয়তার দল গঠন করা যেতে পারে।

আবার আমাদের নিকট ও দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের নিয়ে যদি আরেকটি আত্মীয়তার দল গঠন করা হয় তাহলে কোনটি বড় দল হবে? নিশ্চয়ই দ্বিতীয় দলটির সদস্য অনেক বেশি হবে, তাই না? এই আত্মীয়তার ছোট ও বড় দলগুলোকে আমরা বলি বংশ, গোত্র ইত্যাদি।

আমাদের সমাজ জীবনে বংশধারা অনুযায়ী এ সব আত্মীয়তার দলগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সমাজে সম্পদের উত্তরাধিকার থেকে শুরু করে পরবর্তী গ্রাম বা সমাজপ্রধান কে হবে, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে কার ভূমিকা কী হবে, ইত্যাদি নির্ধারণে বংশধারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কার জমি কে পাবে, কতটুকু পাবে সেটিও বংশধারার আইন অনুযায়ী চলে। আবার নানা ধরনের সামাজিক দলের সদস্যপদ ঠিক করা হয় বংশদলের মাধ্যমে। চাষাবাদে বা ঘরবাড়ি তৈরিতে সহযোগিতার দরকার হলে তা বংশদলের

মাধ্যমে পূরণ করা হয়। পারস্পরিক রাজনৈতিক সহযোগিতা অথবা সংঘাতের সময় বংশদলের সাহায্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার কে কাকে বিয়ে করতে পারবে আর কে কাকে পারবে না, সেটিও নির্ধারিত হয় বংশধারার মাধ্যমে। এছাড়াও বিয়ের সময় কনে পক্ষ এবং বর পক্ষের মধ্যে সম্পদের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও বংশধারার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।

আত্মীয়তার দল- বংশ ও গোত্র : বংশ বা কুল বলতে আমাদের সরাসরি রক্তের সম্পর্কের পূর্বপুরুষদের পরিচিতি বোঝায়। অর্থাৎ আমাদের আগের পুরুষদের মধ্যে প্রাচীনতম ব্যক্তি যার পরিচয় এবং সরাসরি সম্পর্ক আমরা জানি, তার বংশধরদের সবাই এক বংশ বা কুলের অন্তর্গত। সাধারণত, পূর্বের আট থেকে দশ পুরুষ হতে এখন পর্যন্ত সম্পর্কিত আত্মীয়রা একই বংশের সদস্য। সমাজে একই বংশের সদস্যদের বিবেচনা করা হয় একটি সক্রিয় সামাজিক দল হিসেবে। কেননা, একই বংশের সদস্যরা আপন আত্মীয় হিসেবে পরস্পরের প্রয়োজনে এগিয়ে আসে, চাষাবাদে সহযোগিতা করে, একসাথে চলাফেরা করে এবং মিলিতভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপন করে ইত্যাদি।

বহু পুরুষ আগের কারো নাম হয়ত আমরা শুনেছি, কিন্তু তার সাথে সম্পর্কের সরাসরি যোগসূত্র এখন আমরা আর জানি না, এমন সদস্যদের সবাইকে নিয়ে একটি গোত্র গড়ে উঠে। একই গোত্রের সদস্যরা সবাই বিশ্বাস করে যে তারা একই আদি পুরুষের বংশধর, কিন্তু সম্পর্কের সরাসরি যোগসূত্র তারা সবসময় জানে না।

গোত্রের পূর্বতম পুরুষ সাধারণত বিশ্বাস নির্ভর এবং কাল্পনিক কোনো ব্যক্তি। কয়েকটি বংশ মিলেই একটি গোত্র গড়ে উঠে। আর কয়েকটি গোত্র একসঙ্গে একটি নৃগোষ্ঠী গড়ে তোলে।

উদাহরণস্বরূপ, যেমন ধরে নেয়া যাক, বান্দরবানের ম্রো নৃগোষ্ঠীর একজন ছেলের নাম দুরন। তার গোত্রের নাম হলো তাইসাং। দুরনের মতো মেনলুংও আরেকজন তাইসাং। দুরনের দাদার বাবার বাবা হলেন উইলেন, যিনি মেনলুং-এর সম্পর্কে দাদার বাবা হন। সুতরাং, দুরন ও মেনলুং দুইজনই একই বংশের সদস্য। কিন্তু ম্রো নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে আরও কয়েক শত মানুষ আছে যারা তাইসাং গোত্রের সদস্য। যারা দূর-দূরান্তের বিভিন্ন ম্রো গ্রামে ছড়িয়ে আছে। দুরন এদের সবাইকে চেনে না, অনেককে কখনো দেখেনি, বা সবার নামও জানে না। তবে সব তাইসাংদের মত দুরনও বিশ্বাস করে তারা সবাই একই পূর্বপুরুষের বংশধর। তাই সকল তাইসাং সদস্যই একই গোত্রের অন্তর্গত।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	একটি বংশের সকল সদস্যেদের একটি সামাজিক দল বলার কারণ লিপিবদ্ধ কর।
কাজ- ২ :	সমাজ জীবনে বংশধারা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

পাঠ- ১২ : বংশধারার প্রকারভেদ

বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে প্রধানত দুই ধরনের বংশধারা ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা: (১) পিতৃসূত্রীয় বংশধারা এবং (২) মাতৃসূত্রীয় বংশধারা। বাঙালিদের সংস্কৃতিতে দেখা যায় যে, সন্তানরা তাদের বাবার বংশের সদস্য হিসেবে পরিচিত হয়। অন্যদিকে মান্দি সংস্কৃতিতে সন্তানরা পরিচিত হয়

মা-র বংশের সদস্য। যেমন, নমিতা চিরান একজন মান্দি মেয়ে। তার মা-র নাম মমতা চিরান ও বাবার নাম লিপ্টন মারাক। নমিতার পদবি চিরান এবং সে তার মা-র বংশ অর্থাৎ চিরান বংশের সদস্য। মান্দি নিয়ম অনুযায়ী ধরে নেওয়া হয় নমিতা চিরান বংশের অন্য সকল সদস্যের সাথে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত।

পিতৃসূত্রীয় বংশধারা : আমাদের দেশের অধিকাংশ নৃগোষ্ঠীর বংশধারাই পিতৃসূত্রীয়। সন্তানরা বাবার পরিচয়ে পরিচিত হয় সমাজে, আর বাবা পরিচিত হয় তার বাবার পরিচয়ে। সুতরাং, পিতৃসূত্রীয় বংশধারা বলতে বোঝায়, যখন একজন ব্যক্তিকে তার পিতার বংশের সদস্য বলে চিহ্নিত করা হয়। এ ধরনের সমাজে কারো মা বা নানীর পরিচয় বিশেষ কোনো গুরুত্ব বহন করে না। পিতৃসূত্রীয় বংশধারা অনুযায়ী, একটি গোত্রের সকল সদস্য বিশ্বাস করে, তারা সবাই প্রাচীনকালের কোনো একজন নির্দিষ্ট পুরুষের বংশধর। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই গোত্রের সকলের মাঝে ঐক্য গড়ে উঠে।

পিতৃসূত্রীয় বংশধারার রীতি অনুযায়ী, কারো ফুফাতো বা মামাতো ভাই-বোন তার বংশধারার সদস্য নয়। এদেশে মান্দি ও খাসি ছাড়া অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর, যেমন, বাঙালি, সাঁওতাল, ওরাঁও, চাকমা, মারমা ইত্যাদি সবাই পিতৃসূত্রীয় বংশধারা অনুসরণ করে। এ ধরনের সংস্কৃতিতে, কোনো মহিলার সন্তানরা ঐ মহিলার বাবার বংশধারার সদস্য হয় না।

মাতৃসূত্রীয় বংশধারা : মান্দিদের মধ্যে মাতৃসূত্রীয় বংশধারা দেখতে পাওয়া যায়। এ ধারা অনুযায়ী একজন ব্যক্তি, তার মাতার বংশধারার সদস্য। একই মায়ের বংশধারার সদস্যরা তাদের পূর্বসুরি হিসেবে একজন নারীকে নির্ধারণ করে থাকে। অতএব, নারীর বংশধর নিয়ে গঠিত আত্মীয়তার ধারাকে মাতৃসূত্রীয় বংশধারা বলা হয়। অর্থাৎ এই প্রথা অনুযায়ী সন্তানরা তাদের মা-র গোত্রের সদস্য। তাই একজন পুরুষ তার মা-র গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হলেও তার সন্তানরা তার গোত্রভুক্ত নয়।

মাতৃসূত্রীয় রীতিতে মান্দি নৃগোষ্ঠীর কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং মধুপুরের শালবন এলাকায় মূলত মান্দিদের বসতি। তাদের সংস্কৃতিতে সন্তানেরা তার মায়ের বংশধারার সদস্য বলে বিবেচিত হয়। ছেলে সন্তানেরা তাদের বিয়ের পর তাদের স্ত্রীদের বাড়িতে বা এলাকায় গিয়ে বসবাস করে এবং তাদের সন্তানরা তাদের স্ত্রীদের বংশধারার সদস্য হয়। নারী-পুরুষ উভয়েই মান্দি সমাজে অর্থনৈতিক কাজ অর্থাৎ কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করে। যেহেতু মেয়েরা তার মায়ের সম্পত্তিতে অধিকার পায়, তাই তাদের স্বামীরা তাদের বাড়িতে থাকে ও তাদের জমিতে ফসল ফলায়। আর তার ভাইরাও একই নিয়মে বিয়ের পর অন্য এলাকায় বা অন্য বাড়িতে তাদের স্ত্রী-র সাথে বসবাস করে। যদি কোনো কারণে স্ত্রী-র মৃত্যু হয়, তাহলে ভাইটি অনেক ক্ষেত্রে আবার তার মায়ের বাড়িতে ফিরে আসে এবং তার মা বা বোনদের পরিবারে বসবাস করে। সিলেটের খাসিদের মাঝেও বংশধারার একই রীতির প্রচলন আছে।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	পিতৃসূত্রীয় ও মাতৃসূত্রীয় বংশধারার পার্থক্যগুলো একটি ছকে সাজাও।

পাঠ- ১৩ ও ১৪ : উত্তরাধিকারের ধরন

আমরা যেমন আমাদের পূর্বপুরুষের বংশধর তেমনি আমরা তাদের সামাজিক অবস্থানগত ও মালিকানাধীন বিভিন্ন সম্পদের বৈধ উত্তরাধিকারী। গোত্রের সদস্যপদের মতো বংশধারার প্রথাই নির্ধারণ করে ২০২০

সেই সংস্কৃতিতে উত্তরাধিকারের ধরন কেমন হবে। উত্তরাধিকার বলতে আমরা বুঝি পূর্বপুরুষের সম্পদের উপর আমাদের জন্মগত অধিকার। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে একটি পরিবারে যদি কয়েকজন ভাইবোন থাকে তাহলে তাদের বাবা-মার সম্পদে কার অধিকার কতোটুকু হবে? বিভিন্ন সংস্কৃতি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে।

মানব সভ্যতার শুরুর দিকের সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা বা ব্যক্তিগত সম্পদের ধারণা মানুষের ছিল না। নিজের ব্যবহৃত কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়া বাকি সবকিছুই দলের সকলের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কোনো মৃত ব্যক্তির সৎকারের সাথে সাথেই তার ব্যবহৃত জিনিসগুলোও অনেক সময় নষ্ট করে ফেলা হতো। কৃষির আবিষ্কার মানুষের জীবনে অনেক পরিবর্তন নিয়ে আসে। কৃষিকে ঘিরেই গড়ে উঠে স্থায়ীভাবে বসবাসের সূচনা। ধীরে ধীরে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনের বেশি পরিমাণ ফসল উৎপাদন ও পশুপালন করতে শেখে। ব্যক্তিগত পারিবারিক চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন থেকেই সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা শুরু হয়। এভাবে বিভিন্ন ধরনের সম্পদের উপর ব্যক্তি মালিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে একই সাথে সম্পদের মালিকানা বদল করার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে যে কোনো সংস্কৃতির জন্য।

ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা বদলের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো উত্তরাধিকার ব্যবস্থা। সংস্কৃতিতে বংশধারার নিয়ম অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির সম্পদের মালিক হলো তার বংশধর। পিতৃতান্ত্রিক বংশধারায় ছেলে আর মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মেয়ে সন্তানরা পারিবারিক সম্পদের উত্তরাধিকার। কিন্তু এর মাঝেও সংস্কৃতিভেদে কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায়। কেননা, কিছু সংস্কৃতিতে সকল উত্তরাধিকারীর মাঝে সম্পদ সমানভাবে বণ্টিত হয় না। সন্তানদের মধ্যে যার দায়িত্ব বেশি তার উত্তরাধিকৃত সম্পত্তির পরিমাণও বেশি হয়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের উত্তরাধিকার ব্যবস্থা তাহলে দুভাবে নির্ধারিত হয় : (১) বংশধারার ভিত্তিতে এবং (২) দায়িত্বের ভিত্তিতে।

(১) বংশধারার ভিত্তিতে উত্তরাধিকার :

পিতৃসূত্রীয় রীতি	পিতৃসূত্রীয় ব্যবস্থায় বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলো তার ছেলে সন্তানরা।
মাতৃসূত্রীয় রীতি	মায়ের ব্যবহৃত জিনিসপত্র এবং মালিকানাধীন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলো মেয়ে সন্তানরা।

উদাহরণস্বরূপ, ওরাঁও সংস্কৃতিতে পিতার সম্পত্তিতে মেয়েদের কোনো মালিকানা বা অধিকার নেই। পিতার মৃত্যুর পর পুত্ররাই সমান হারে ভাগ পায়। তবে সম্পত্তি ভাগাভাগির সময় মেয়েরা একটি করে গাভী পেয়ে থাকে। আবার, খাসি সমাজে মাতৃসূত্রীয় উত্তরাধিকার রীতি দেখা যায়। তাদের সমাজে মেয়েরাই যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী হয়ে থাকে।

(২) দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভিত্তিতে উত্তরাধিকার :

বড়দের অধিকার	কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবারের বড় সন্তান সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে বিবেচিত হয়। কেননা, পরিবারের সবার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব থাকে বড় সন্তানের উপর।

ছোটদের অধিকার	এ নীতি অনুযায়ী পরিবারের ছোট সন্তান সম্পত্তির সিংহভাগের অধিকারী হয়। কেননা, বৃদ্ধ বয়সে বাবা-মা ছোট সন্তানের সাথে বসবাস করে।

বাংলাদেশের খাসি ও মান্দিদের মধ্যে ছোট সন্তানদের অধিকার-রীতি দেখা যায়। এদের মাঝে সাধারণত বসতবাড়ির মালিক হয় ছোট মেয়ে। বৃদ্ধ বয়সে বাবা-মা ছোট মেয়ের সাথে থাকে। এমনকি মৃত্যুর পর বাবা-মার সৎকারের দায়িত্ব পালন করে ছোট মেয়ে।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	উত্তরাধিকার বলতে কী বোঝায়? সমাজভেদে কতো ধরনের উত্তরাধিকারের নিয়ম দেখা যায়?
কাজ- ২ :	মান্দি,খাসি ও ওরাঁও সমাজে উত্তরাধিকারের নিয়মগুলো ছকে উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কোন রেখাচিত্র দিয়ে পূর্বপুরুষদের পরিচিতি লিপিবদ্ধ করা হয়?

ক. ভৌগোলিক রেখাচিত্র খ. আত্মীয়তার সম্পর্কের রেখাচিত্র

গ. জ্যামিতিক রেখাচিত্র ঘ. সামাজিক রেখাচিত্র

২. একজন মানুষকে দায়িত্ববান হতে শেখায় নিচের কোন প্রতিষ্ঠান?

ক. পরিবার খ. মসজিদ

গ. বিদ্যালয় ঘ. মন্দির

৩. বাঙালি এবং ওরাঁও সমাজে পিতা বংশধারার মাধ্যম হওয়ায় তাদের পূর্বপুরুষ হচ্ছে -

i. পিতা ও মাতা

ii. পিতা ও পিতামহ

iii. প্রপিতামহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

৪. কোন নৃগোষ্ঠী দলের বাইরে বিয়ে করে?

ক. সাঁওতাল খ. মান্দি

গ. খাসি ঘ. ম্রো

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

তনয় দেওয়ান স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বাবার বাড়িতে ভাইদের সাথে বসবাস করে। পাশেই ক্যালাউ মারমার বাড়ি। তাদের দুই পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

৫. তনয় দেওয়ানের পরিবারটি হলো-

ক. নয়াবাস পরিবার খ. অণুপরিবার

গ. যৌথ পরিবার ঘ. মাতৃবংশীয় পরিবার

৬. তনয় দেওয়ান ও ক্যালাউ মারমার পরিবারের সম্পর্ককে বলা যায় -

i. রক্তের আত্মীয়

ii. বৈবাহিক আত্মীয়

iii. কাল্পনিক আত্মীয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. মিনাক্ষী ও তার বোনেরা বর ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে মা প্রমিতা দ্রং এর বাড়িতে বসবাস করে। তাদের সন্তানেরা প্রমিতার পরিচয়ে বড় হয় যদিও মিনাক্ষীর ছোট বোনের বিয়ে হয় অন্য গোত্রে। তাদের পরিবারে সম্পত্তির অধিকারী কে হবে তা নিয়ে অনেক নিয়মকানুন প্রচলিত আছে।

ক. কয়েকটি গোত্র একসঙ্গে কী গড়ে তোলে? ১

খ. উত্তরাধিকার ধারণাটি বর্ণনা কর। ২

গ. মিনাক্ষীর পরিবার কীভাবে নিজ সংস্কৃতির সংহতি রক্ষা করছে? ৩

ঘ. নিজস্ব সংস্কৃতির আলোকে প্রমিতার পরিবারটির বংশধারা রক্ষা হয়–মতামত দাও। ৪

২.

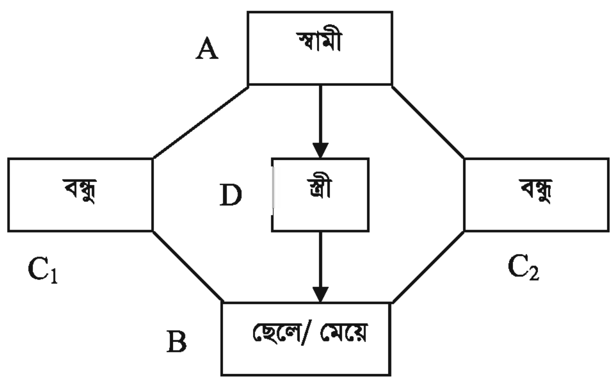

ছক : আত্মীয়তার সম্পর্ক

ক. কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয়?

খ. সমাজ কাঠামো বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে A এবং D ব্যক্তির আত্মীয়তার ধরন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের DB এবং BC_2-এর মধ্যকার আত্মীয়তার সম্পর্কের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

৩. রাজিব ও সজিব সহপাঠী বন্ধু। তাদের দু'জনের পরিবার নিচের ছকে দেখানো হলো :

রাজিবের পরিবারের সদস্য	**সজিবের পরিবারের সদস্য**
- রাজিব নিজে	- সজিব নিজে
- বাবা ও মা	- বাবা ও মা
- ২ বোন	- চাচা ও ফুফু
	- ১ ভাই ১ বোন

ক. কোনটির মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয়? ১

খ. বর্ধিত পরিবারের ধারণাটি বর্ণনা কর। ২

গ. রাজিবের পরিবারের ধরন রেখাচিত্র অঙ্কন করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শিশুর সামাজিকীকরণে সজিবের পরিবারটিকে তুমি কি অধিক সহায়ক মনে কর? মতামত দাও। ৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসব

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো নানা উৎসব অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। বর্ণিল এবং বৈচিত্র্যময় এসব উৎসব তাদের জীবন ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ উৎসবের মধ্য দিয়ে মূলত আনন্দ ও ঐক্যের মেলবন্ধন ঘটে। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় এসব উৎসব পালিত হয়। বিশেষ কিছু দিনে এই উৎসবগুলো আয়োজন করা হয়। এই অধ্যায়ে আমরা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কয়েকটি উৎসব সম্পর্কে বিস্তারিত জানব।

চিত্র- ৬.১ : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসব

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসবগুলো সম্পর্কে যথাযথ ধারণা লাভ এবং এসব উৎসব পালনের সামাজিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারব।
- উৎসবগুলোর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা এবং বাংলাদেশের পাহাড় ও সমতলে এসব উৎসব পালনে যে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করতে পারব।
- বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসবের একটি অঞ্চলভিত্তিক ছক তৈরি করতে পারব।
- নিজের এলাকায় উদযাপিত গুরুত্বপূর্ণ উৎসবগুলো সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারব।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসব ও বৈচিত্র্যের বিষয়ে আরও জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হব।
- এসব উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে যে সামাজিক সংহতি ও ঐক্য গড়ে ওঠে তা উপলব্ধি করব।

২০২০

পাঠ- ০১ : বৈসাবি উৎসব

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা– খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর জন্য বৈসাবি একটি সর্বজনীন ধর্মীয়-সামাজিক উৎসব। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। চৈত্র মাসের শেষ দুই দিন এবং নববর্ষের প্রথম দিনকে ঘিরে বৈসাবি উৎসব পালিত হয়। বৈসাবি আসলে ত্রিপুরাদের 'বৈসু', মারমা ও রাখাইনদের 'সাংগ্রাই', চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের 'বিঝু',অহমিয়াদের 'বিহু' প্রভৃতি উৎসবের সমষ্টি। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মূল উৎসবের নামের প্রথম অক্ষরটি নিয়ে 'বৈসাবি' শব্দটি সৃষ্টি করা হয়েছে। এর পেছনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে। সেটি হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে পাহাড়ি ছাত্র ও যুব সমাজের কিছু অগ্রণী সদস্যের উদ্যোগে এই সমন্বিত উৎসবটি চালু হয়। এর পেছনে যে সামাজিক বাস্তবতা বা প্রেক্ষাপট পাহাড়ি তরুণ-তরুণীদের এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা জানা থাকা প্রয়োজন।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগ পর্যন্ত পাহাড়ের পরিস্থিতি ছিল খুব অশান্ত ও সংঘাতপূর্ণ। এ সময় শিক্ষার্থী এবং যুব সমাজের সচেতন ও অগ্রসর অংশটি এগিয়ে আসে। তারা স্কুল-কলেজের ছাত্র- যুবাদের সাথে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেয় যে, এরপর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের প্রধান উৎসবটি সবাই মিলে একসাথে উদ্‌যাপন করা হবে। তারা বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকে এমন একটি নামও এই উৎসবের জন্য ঠিক করে যা 'বৈসাবি' নামে পরিচিত হয়। পার্বত্য তিন জেলার মধ্যে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগেই সর্বপ্রথম বৈসাবি উৎসবটি পালিত হয়। এর পরবর্তী সময় থেকে চৈত্র সংক্রান্তি উৎসবটি পার্বত্য চট্টগ্রামে 'বৈসাবি' নামে সম্মিলিতভাবে পালিত হয়ে আসছে। অবশ্য একইসাথে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী নামেও সেটি পালন করা হয়। সবার কাছে 'বৈসাবি' এখন বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, শান্তি ও ঐক্যের প্রতীক। খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ফুল সংগ্রহ করে নদী ও মন্দিরে গিয়ে পূজা অর্চনা, ঘরদোর সাজানো, ছোট বড় সবার অংশগ্রহণে প্রভাতফেরী, দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবার সাথে কুশল বিনিময়, পানাহার, শিশু ও বয়স্কদের বিশেষ যত্ন নেওয়া, সন্ধ্যায় মন্দিরে গিয়ে মোম ও আগরবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা এবং জগতের সকল মানুষ ও প্রাণীর জন্য মঙ্গল কামনার মধ্য দিয়ে বৈসাবি উৎসবটি উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষে সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলে নানা ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা এবং শহরাঞ্চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এমনকি কিছু সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে সপ্তাহ বা মাসব্যাপী বৈসাবি মেলাও চলে। সবাই মিলে এই উৎসব উদযাপনের পাশাপাশি উৎসবটি উপলক্ষে পাহাড়িদের বিভিন্ন সংগঠন এবং ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণীদের উদ্যোগে সমাজ সংস্কৃতির নানা বিষয় নিয়ে সংকলন, প্রকাশনা, গানের সিডি, দেয়াল পত্রিকা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। এছাড়া ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে নাটক, ঐতিহ্যবাহী পালাগানের আসর, আলোচনা সভা, সেমিনার প্রভৃতি এখন এই উৎসবের বাড়তি আকর্ষণ।

অনুশীলন

কাজ- ১ :	বৈসাবি উৎসবটি কারা চালু করে এবং কেন?
কাজ- ২ :	বৈসাবি উৎসবের কিছু কার্যক্রমের নাম লিখ।

পাঠ- ০২ : ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর বৈসু উৎসব

'বৈসু' ত্রিপুরাদের প্রধান সামাজিক উৎসব। তিন দিন ধরে এই উৎসব পালিত হয়। তবে এই তিন দিনের জন্য 'বৈসু'র রয়েছে তিনটি আলাদা নাম। যেমন– প্রথম দিনের নাম হলো হারি বৈসু, দ্বিতীয় দিনের নাম বৈসুমা এবং তৃতীয় দিনটি উদযাপিত হয় বিসিকাতাল নামে। পুরনো বছরের বিদায় এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর লক্ষ্যে এই ঐতিহ্যবাহী উৎসব যুগ যুগ ধরে উদযাপিত হয়ে আসছে।

হারি বৈসু : এটি বৈসুর প্রথম দিন এবং মূলত প্রস্তুতি পর্ব। ত্রিপুরা নারীরা ঐদিন বিন্নি চাল গুঁড়ো করে তা দিয়ে সুস্বাদু পিঠা তৈরি করে। 'হারি বৈসু'র দিন ঘরে ঘরে পিঠা বানানোর ধুম পড়ে যায়, যা পরবর্তী দুই দিনেও কমবেশি অব্যাহত থাকে। ঐদিন ত্রিপুরা নারী-পুরুষ মিলে সকাল সকাল বনে গিয়ে কলা পাতা, লাইরু পাতা সংগ্রহ করে আনে। এসব পাতা ব্যবহার করে তারা বৈসুর হরেক রকম পিঠা তৈরি করে।

চিত্র- ৬.২ : ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান

বাড়িঘর পরিপাটি করে সাজানোর পাশাপাশি 'হারি বৈসু'র দিন ত্রিপুরা নারীরা পরিবারে ব্যবহার্য যাবতীয় কাপড়-চোপড় ধুয়ে পরিষ্কার করে নেয়। গ্রামের সব বয়সের নারী-পুরুষ সেদিন খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ফুল সংগ্রহে নেমে পড়ে এবং সকাল সকাল নদীতে স্নান সেরে সংগৃহীত ঐসব ফুল নদীতে উৎসর্গ করে। ঘরের কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করার মধ্য দিয়ে পুরনো বছরের যাবতীয় বিপদ-আপদ, জঞ্জাল ও দুঃখ-বেদনা ধুয়ে মুছে যাবে বলে ধারণা করা হয়। 'হারি বৈসু'র দিন থেকে 'গরয়া নৃত্য' শুরু হয় এবং একটানা ৫/৭ দিন ধরে এই নৃত্য চলতে থাকে। নৃত্যে অংশগ্রহণকারীদের 'গরয়া চেরক' নামে ডাকা হয়। তারা গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে ঢাক-ঢোল-বাঁশি বাজিয়ে এই নৃত্য পরিবেশন করে।

'হারি বৈসু'র দিনে গৃহকর্তা ঘরের গবাদিপশুগুলোকে পরিচর্যা ও আদরযত্ন করে থাকেন। যেহেতু গবাদিপশু দিয়ে হাল চাষ থেকে শুরু করে পরিবারের অনেক উপকার সাধিত হয়, সেজন্য ঐদিন গবাদিপশুর শিং ও গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

বৈসুমা : বৈসুমার দিনটি ত্রিপুরাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মহান একটি দিন। কারণ এই দিনে ত্রিপুরা সমাজে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকে না। সবাই একে অপরের বাড়িতে বেড়াতে যায় এবং একে অপরের সমব্যথী হয়। ধনী-গরিব সবাই সামর্থ্য অনুযায়ী নানা ধরনের পিঠা, সরবত, পাঁচন ইত্যাদি অতিথিদের পরিবেশন করে। তবে 'বৈসুমা'র দিনে প্রাণীবধ একেবারেই নিষিদ্ধ। ঐদিন গরয়া নৃত্য পরিবেশন ছাড়াও পালা গান এবং বিভিন্ন খেলাধুলা সারাদিন ধরে চলে।

বিসিকাতাল : 'বৈসু'র এই দিনটি নববর্ষকে স্বাগত জানানোর দিন। শিশু-কিশোর ও যুবক-যুবতীরা নতুন কাপড়-চোপড় পরিধান করে গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে হাঁস-মুরগি এবং অন্যান্য পশু-পাখির জন্য খাবার বিলিয়ে দেয়। ত্রিপুরাদের সামাজিক রীতি অনুসারে তারা বয়স্কদের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করে। গ্রামের যুবক-যুবতী ও নবদম্পতি নদী কিংবা কুয়ার স্বচ্ছ ও সতেজ পানি তুলে এনে গ্রামের মুরুব্বি বা

বয়স্কদের স্নান করায় এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করে। এই দিনে পরিবারের সকল সদস্যের মঙ্গলের জন্য পূজা ও উপাসনা করা হয়। গ্রামের প্রত্যেকটি ঘরের দরজা সারা দিন-রাত খোলা থাকে অতিথিদের জন্য। মনে করা হয়ে থাকে যে, এই দিনে কিছু না খেয়ে কেউ ফিরে গেলে তা গৃহস্থের জন্য অমঙ্গল।

অনুশীলন	
কাজ- ১ :	ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর বৈসু উৎসবের তিনটি দিনের কর্মকান্ডের বিবরণ নিচের ছক অনুযায়ী সাজিয়ে লিখ।

বৈসুর তিন পর্বের নাম	কর্মকাণ্ডের বিবরণ
হারি বৈসু	
বৈসুমা	
বিসিকাতাল	

পাঠ- ০৩ : মারমা ও রাখাইন নৃগোষ্ঠীর সাংগ্রাই উৎসব

মারমা ও রাখাইন সমাজের প্রধান সামাজিক উৎসব হলো সাংগ্রাই (বর্ষবরণ ও বর্ষবিদায়)। চৈত্র মাসের শেষ দু'দিন এবং নতুন বছরের প্রথম দিন (সাধারণত এপ্রিল মাসের ১৩ বা ১৪ তারিখ) এই উৎসব পালিত হয়। মারমা ও রাখাইন সমাজে এই উৎসবের ধর্মীয় গুরুত্বও কম নয়। সাংগ্রাই-এর প্রথম দিনে তরুণ-তরুণীরা সবাই মিলে এলাকার বৌদ্ধ মন্দিরগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তোলে। সমাজের ছোট বড় সবাই মিলে বৌদ্ধ মন্দিরে যায় এবং তারা প্রদীপ জ্বালিয়ে জগতের সকল প্রাণীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য পরম ভক্তি ও যত্নের সাথে সকাল ও দুপুরের ছোয়াইং (খাবার) দান করা হয়। এছাড়া মন্দিরের বুদ্ধমূর্তিগুলোকে শোভাযাত্রা সহকারে নদীতীরে নিয়ে গিয়ে স্নান করানো হয়। এ সময় লোকজন চন্দনের জল ও ডাবের পানি সাথে করে নিয়ে যায়। বুদ্ধমূর্তিগুলোকে বাঁশের তৈরি সুসজ্জিত একটি মঞ্চে রাখা হয়। এরপর ভক্তরা চন্দন ও ডাবের পানি বুদ্ধমূর্তিগুলোর উপর ঢেলে দেয়। ঢেলে দেওয়া এসব পানি লোকজন সংরক্ষণ করে রাখে। এই পানি খেলে রোগ-ব্যাধির নিরাময় ঘটে বলে তাদের বিশ্বাস। স্নানের পর বুদ্ধমূর্তিগুলোকে নতুন চীবর পরিয়ে দিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হয়। প্রার্থনার সময় সাধারণত যেসব প্রদীপ জ্বালানো হয় তার বাইরেও অনেকে ঐদিন হাজার বাতি জ্বালিয়ে থাকে। এর পরবর্তী দুই দিনও মহাসমারোহে সাংগ্রাই উৎসবটি পালিত হয়। এই দিনগুলোতে ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন প্রকারের পিঠাসহ বিশেষ উপাদেয় খাবার তৈরির ধুম পড়ে যায়।

চিত্র- ৬.৩ : মারমা ও রাখাইন নৃগোষ্ঠীর পানিখেলা উৎসব

২০২০

বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে পূজার মধ্য দিয়ে সমাজের প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মান জানানো হয়। মৈত্রী পানি বর্ষণ সাংগ্রাই উৎসবের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। এজন্য বড় কোনো মাঠে একটি মন্ডপ বানানো হয়। মন্ডপের দুই দিকে দুটি বড় পানিভর্তি নৌকা রাখা হয়। তরুণ ও তরুণীদের আলাদা দু'টি দল দুই নৌকার পাশে অবস্থান নেয়। এরপর তারা পরস্পরের দিকে নৌকায় রাখা পানি ক্রমাগত ছুড়তে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না পানিটা ফুরিয়ে যায়। খালি নৌকাটি পুনরায় পানি দিয়ে ভরানো হয়। একটা দল খেলা শেষ করলে নতুন আরেকটা দল এসে খেলা শুরু করে। ঐতিহ্যবাহী এই জলকেলি ছাড়াও সাংগ্রাই উপলক্ষে মারমা ও রাখাইন সমাজে একসময় নৌকাবাইচ, বলীখেলা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল।

অনুশীলন

কাজ- ১ : মারমা ও ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর চৈত্র সংক্রান্তি বা বৈসাবি উৎসব পালনের মধ্যে যেসব মিল ও অমিল রয়েছে সেগুলো খুঁজে বের কর এবং নীচের টেবিলে সাজাও।

ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর চৈত্র সংক্রান্তি উৎসব - বৈসু		মারমা নৃগোষ্ঠীর চৈত্র সংক্রান্তি উৎসব- সাংগ্রাই
মিল		
অমিল		

পাঠ- ০৪ ও ০৫ : চাকমা নৃগোষ্ঠীর বিঝু উৎসব

চাকমা সমাজের সবচেয়ে বড় এবং ঐতিহ্যবাহী সর্বজনীন উৎসব হলো বিজু বা বিঝু উৎসব। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মতো চাকমারাও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এই উৎসব পালন করে থাকে।

চৈত্র মাসের শেষ দুই দিন এবং বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন মিলিয়ে মোট তিন দিন ধরে বিঝু উৎসবটি পালিত হয়। বয়স্করা বলেন, আগে যখন সুদিন ছিল তখন কমপক্ষে সাত দিন ধরে বিঝু উৎসব পালন করা হতো। চাকমাদের বিঝু উৎসবটি তিন পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বটি হচ্ছে 'ফুলবিঝু', দ্বিতীয় পর্বটি 'মূলবিঝু' এবং তৃতীয় পর্বটি 'নুওবঝর' (নতুন বছর) বা 'গোজ্যাপোজ্যা বিঝু' (শুয়ে বসে আরাম আয়েসে কাটানোর দিন)

ফুল বিঝু : এদিন খুব ভোরবেলা শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীরা বন কিংবা বাগান থেকে হরেক রকমের ফুল সংগ্রহ করে আনে। সকালে তারা নদীতে গোসল করতে যায়। সে সময় তারা পাতার নৌকা বা পাত্র তৈরি করে তার উপর ফুল সাজিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। সংগৃহীত ফুল দিয়ে তারা বাড়ির আঙিনা, দরজা প্রভৃতি সাজায়। কিয়াঙ বা বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়েও তারা বুদ্ধের উদ্দেশ্যে ফুল দেয়। ঐদিন (বা তারও আগে) গৃহকর্ত্রীর নেতৃত্বে ঘরের কাপড়-চোপড় ও ঘরদোর পরিষ্কার করা হয়। সন্ধ্যায় ঘরের আঙিনায় বা কিয়াঙে (মন্দির) গিয়ে মোমবাতি জ্বালানো হয়। এ সময় তারা নিজেদের আত্মীয়স্বজনসহ পৃথিবীর সকল প্রাণী ও বিশ্বের শান্তির জন্য প্রার্থনা করে। এদিন সকালবেলা শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গৃহপালিত পশু-পক্ষীদেরকে ধান, চাল, খই প্রভৃতি খাদ্য দিয়ে থাকে।

মূল বিঝু : বিঝুর তিন দিনের মধ্যে এই মূলবিঝুর দিনটি সবচেয়ে উৎসবমুখর, সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত দিন। নৃগোষ্ঠী-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে, পরিচিত-অপরিচিত সবার জন্য ঘরের দরজা খোলা থাকে। ঘরে যার যা আছে তা দিয়ে সবাইকে অত্যন্ত যত্ন ও আগ্রহ সহকারে আপ্যায়ন করা হয়। ঐদিন ঐতিহ্যবাহী নানা ধরনের নানা স্বাদের পিঠা, তাজা ফলমূল এবং সেদ্ধ করা মিষ্টি আলু মূলতঃ সকাল বেলার অতিথিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়। বিঝুর দিন একটি বিশেষ ধরনের পাঁচমিশালী উপাদেয় খাবার পরিবেশন করা হয় যার নাম 'পাজন'। পাঁচ অন্ন (পাঁচন) শব্দ থেকেই সম্ভবত 'পাজন' শব্দের উৎপত্তি। এই পাজন তৈরি হয় কমপক্ষে পাঁচ পদের সবজি দিয়ে। তবে সবাই চেষ্টা করে পাজন-এ সবজির সংখ্যা বাড়াতে। এটি বিঝু উৎসবের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি উপাদান। বিঝুর দিন প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 'জগরা' পানীয় পরিবেশন করা হয়। 'জগরা' হলো বিন্নি ধানের চাল দিয়ে তৈরি এক ধরনের মিষ্টি জাতীয় পানীয় যা সাধারণত বিঝু উপলক্ষে তৈরি করা হয়। আর 'দচুনি' হলো চাকমাদের একটি ঐতিহ্যবাহী পানীয় যা সচরাচর বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে কিংবা বেড়াতে আসা ঘনিষ্ঠ ও সম্মানিত অতিথিদের আপ্যায়নে একটি অপরিহার্য পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গ্রামাঞ্চলে সান্ন্যাপিধ্যা, বিনিপিধ্যা, বিনি হগা, কলাপিধ্যা, বরাপিধ্যা, চিনি পানাহ্ প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী পিঠাপুলি ও পানীয় পরিবেশনের রেওয়াজ থাকলেও বর্তমানে শহরাঞ্চলে এসব খুব কমই দেখা যায়।

চিত্র- ৬.৪: বিঝু উৎসব

চিত্র- ৬.৫ : চাকমা নৃগোষ্ঠীর বিঝু উৎসব

দুপুরে তরুণ-তরুণীরা নদী বা কুয়ো থেকে কলসি ভরে জল এনে বয়স্কদের গোসল করায়। বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে বুদ্ধের মূর্তিকেও গোসল করানো হয়। এভাবে গোসল করা বা করানোটা হলো পুরনো বছরের সব জঞ্জাল, অশুভ বা বিপদ আপদ থেকে মুক্ত হয়ে পূতপবিত্র হওয়ার প্রতীক। সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালিয়ে বুদ্ধকে, গঙ্গী-মাকে (নদীকে) পুনরায় পূজা করা হয়। বাসার প্রতিটি কামরায় ও দরজায় মোমবাতি জ্বালানো হয় এবং গোয়ালঘরেও মোমবাতি দেয়া হয়। চাকমাদের বিশ্বাস, এতে পুরনো বছরের সব অজ্ঞানতা, অন্ধকার ও আপদ-বিপদ দূর হয়ে যায় এবং নতুন বছরের দিনগুলো মানুষের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে নিয়ে আসে।

নুও-বঝর বা গোজ্যাপোজ্যা বিঝু : এই দিনটি পালিত হয় মূলতঃ নানা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। ঐদিন অনেকে কিয়াঙে যায় অথবা বাড়িতে কোনো বৌদ্ধ ভিক্ষুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে মঙ্গলসূত্র শ্রবণ করে, যাতে নতুন বছরটি ভালোভাবে কেটে যায়।

অনুশীলন

কাজ- ১ : চাকমা নৃগোষ্ঠীর বিঝু উৎসবের তিনটি দিনের কর্মকাণ্ডের বিবরণ সাজিয়ে লিখ।

পাঠ- ০৬ : ম্রো নৃগোষ্ঠীর চিয়াসৎপয় উৎসব

ম্রো নৃগোষ্ঠীর ভাষায় 'চিয়া' মানে গরু আর 'সৎ' মানে বল্লম দিয়ে হত্যা করা। 'পয়' মানে হলো অনুষ্ঠান। তাই 'চিয়াসৎ পয়' একটি গো-হত্যা উৎসব। এটি ম্রো সমাজের সর্ববৃহৎ সামাজিক অনুষ্ঠান। পরিবারের রোগ মুক্তি ও সুখ সমৃদ্ধি কামনায় এবং উচ্চ ফলনের আশায় সৃষ্টিকর্তা 'থুরাই'কে উদ্দেশ্য করে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সাধারণত ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে এই উৎসব আয়োজিত হয়। জুমচাষের ফসল তোলার পর অবস্থাপন্ন ম্রো পরিবার এই উৎসবের আয়োজন করে।

চিত্র- ৬.৬ : ম্রো নৃগোষ্ঠীর চিয়াসৎপয় উৎসব

এই অনুষ্ঠানের জন্য প্রথমে বাঁশের 'ছিট' (এক প্রকার ফুল) তৈরি করে তা দিয়ে গ্রামের মাঝখানে মাচানের মতো একটি পাটাতন তৈরি করা হয়। অনুষ্ঠানের দিন সন্ধ্যায় ঘেরের মধ্যে গরুটি বাঁধা হয়। অনুষ্ঠান আয়োজনের একদিন আগে যুবক-যুবতীরা দলে দলে অরণ্য থেকে কলাপাতা সংগ্রহ করে আনে। ম্রোরা কলাপাতার উপর খাবার সাজিয়ে পরিবেশন করে। অনুষ্ঠান আয়োজনের এক সপ্তাহ আগে থেকে অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আত্মীয়-স্বজনদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রথম দিনে আমন্ত্রিত অতিথিদের সামাজিকভাবে আপ্যায়ন করতে হয়। কলাপাতায় খাদ্য পরিবেশন করা হয়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে আমন্ত্রিত অতিথি, নিকট আত্মীয় ও গ্রামবাসীরা অনুষ্ঠান আয়োজনকারীকে সম্মান জানিয়ে এক বোতল করে পানীয় উপহার দেয়। ম্রো যুবক যুবতীরা ঐতিহ্যবাহী পোষাকে নিজেদের 'প্লুং' বাঁশির তালে তালে গরুটিকে ঘিরে নৃত্য পরিবেশন করে। সকালে গৃহকর্তা হাতে ধারালো বল্লম নিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে গরুটিকে হত্যা করে। গরুর মাংস রান্না করার পর সকলে মিলে আহার করে। সন্ধ্যা হলে পুনরায় যুবক-যুবতীরা চত্বরে এসে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। ঘুরে ঘুরে নয় বার নৃত্য পরিবেশন করার পর তারা আয়োজকের গৃহে ফিরে গিয়ে নৃত্যের সমাপ্তি ঘটায়। আমন্ত্রিত অতিথিরা গো মাংস নিয়ে যার যার ঘরে ফিরে যায়।

ম্রোদের গো-হত্যা অনুষ্ঠান আয়োজনের পেছনে একটি কিংবদন্তি চালু আছে। সৃষ্টিকর্তা 'থুরাই' ম্রো নৃগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য বর্ণমালা দিয়ে কলার পাতায় লেখা একটি ধর্মগ্রন্থ গরুর মাধ্যমে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। ঐ ধর্মগ্রন্থে ম্রোদের জন্য চাষাবাদ, ধর্মীয় নিয়ম-কানুন, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে উল্লেখ ছিল। তখন সময়টি ছিল গ্রীষ্মকাল। প্রখর রোদে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে একসময় গরুটি প্রকান্ড এক বটগাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়লো। যখন তার ঘুম ভাঙে তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। গরু ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ঐ সময় গ্রন্থখানা খেয়ে ফেললো। ম্রোদের বিশ্বাস, গরুর এ গ্রন্থ খেয়ে ফেলার কারণে তাদের কোনো বর্ণমালা এবং ধর্মগ্রন্থ নেই। সেজন্য তারা প্রতিবছর গো-হত্যা উৎসবের আয়োজন করে থাকে।

চিত্র- ৬.৭ : ম্রো নৃগোষ্ঠীর চিয়াসৎ-পয় উৎসব

অনুশীলন

কাজ- ১ : ম্রো জনগোষ্ঠীর 'চিয়াসৎপয়' উৎসবে প্রতিবছর গো-হত্যা উৎসবের আয়োজন করে থাকে কেন?

পাঠ- ০৭ : সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর সোহরায় উৎসব

ঐতিহাসিককাল থেকে সাঁওতাল সমাজে সোহরায় উৎসবটি পালিত হয়ে আসছে। এটি তাদের সবচাইতে বড় ও ঐতিহ্যবাহী বার্ষিক উৎসব। বাংলাদেশের সাঁওতালরা যথেষ্ট কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করলেও আজও তারা সমান গুরুত্ব দিয়ে সোহরায় উৎসবটি পালন করে। 'হড় হপন'রা (সাঁওতাল) সারা বছর রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, কাদা মাটি মেখে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, গৃহপালিত পশুর সাহায্যে ফসল উৎপাদন করে। এ জন্যই ফসল তোলার পরে গৃহদেবতা, গোত্র দেবতা ও পূর্বপুরুষদের পূজা-অর্চনা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী সকলকে নিয়ে আনন্দ উৎসব এবং গৃহপালিত পশুর পরিচর্যা ও বন্দনার মধ্য দিয়ে সোহরায় উৎসব পালিত হয়। সেইসাথে ভালো ফসলের জন্য দেবতাদের আশীর্বাদ কামনা করা হয়। গ্রাম সংগঠনের প্রশাসকগণ ও গ্রামবাসীরা একটি সাধারণ সভার মাধ্যমে এর দিন-তারিখ নির্ধারণ করে। সোহরায় দিনক্ষণ নির্ধারণের পর থেকেই গ্রামবাসীদের মাঝে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। প্রতিটি পরিবার বাড়ির ভেতরে ও বাইরের সব স্থান ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে এবং লাল মাটি দিয়ে ঘরের

চিত্র- ৬.৮ : উৎসবের সাজে সাঁওতাল

২০২০

দেয়াল ও পিলার রঙিন করে ছবি আঁকে ও উঠানে আল্পনা আঁকে। গৃহকর্তৃগণ হাঁড়িতে পচানি প্রস্তুত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পরিবারের সদস্যদের জন্য নতুন পোশাক পরিচ্ছদ কেনা হয়। এর সঙ্গে চলে আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণের পালা।

পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন এই উৎসব শুরু হয়ে দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে পালিত হয়। এই উৎসবের স্থায়িত্ব ছয় দিন। উৎসবের প্রথম দিনকে উম বা শুদ্ধিকরণ বলা হয়। উৎসবের সূত্রপাত হয় গডটাণ্ডিতে (পবিত্র স্থান)। অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন নায়কে (গ্রাম পুরোহিত)। গ্রামের পুরুষেরা গডটাণ্ডিতে এসে মিলিত হয়। গডটাণ্ডিতে আদি পিতামাতা (পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুঢহি), বারো গোত্রের আদি পুরষ, সিঞ বোঙ্গা (সূর্য দেবতা) ও মারাং বুরুর উদ্দেশে মোরগ-মুরগি, কলা, চিনি, বাতাসা, ধুপ-সিঁদুর দিয়ে পূজা দেয়া হয়। পূজা শেষে তাদের নামে হাণ্ডি নিবেদন করা হয়। যেহেতু সাঁওতালরা বিশ্বাস করে ডিম থেকে মানবকুলের জন্ম তাই পূজার স্থানে একটি ডিম রাখা হয়।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনকে বলা হয় 'বোঙ্গাঃগ্' দিন। এইদিনে সিঞ বোঙ্গা (সূর্য দেবতা), মারাং বুরু (মহান দেবতা), গৃহ দেবতা, গোত্র দেবতার নামে গোত্রভেদে শূকর, ভেড়া, ছাগল ও মোরগ বলি দেওয়া হয় এবং পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে সুনুম পিঠা (তেল পিঠা) ও হাণ্ডি নিবেদন করা হয়। তৃতীয় দিনে গৃহপালিত পশুর যত্ন-পরিচর্যা ও বন্দনা করা হয়। এই তিন দিন বাদ্য-বাজনায় নাচে-গানে আনন্দে গ্রাম ও কুলহি মাতিয়ে রাখার দায়িত্বে থাকেন জগ্‌মানঝহী। তাই গ্রামের যুবকরা মাদল ও নাগরা বাজিয়ে এবং মেয়েরা গান গেয়ে সোহরায়, ডাহার, লাগড়েঁ, গোলওয়ারী ও দুরূমজাঃ নাচ নাচে। চতুর্থ ও পঞ্চম দিনের নাম যথাক্রমে জালে ও হাকো-কাটকম। বর্তমানে অভাবের কারণে বাংলাদেশে এই দুটি দিবস পালন করা হয় না। ষষ্ঠ দিনের নাম সাকরাত। এই দিবসটি চতুর্থ দিনে পালন করা হয়। এই দিনে পুরুষেরা পারস্পরিক বাড়িতে ভাত খেয়ে গ্রামের আশেপাশে জঙ্গলে শিকার করে ফিরে এবং বিকালে ছেলেরা একটি কলাগাছ তীরবিদ্ধ করে। এটাকে 'বেঝাঃ তুইঞ' বলা হয়। এটা মূলত শত্রু প্রতিরোধ ও নিধনের প্রতীক। এই তীর খেলার পরে বিভিন্ন শারীরিক কসরত ও নানান খেলাধুলার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আয়োজিত এই খেলার শেষে কলাগাছ লক্ষ্যভেদকারী বিজয়ীকে জগ্‌মানঝহী ঘাড়ে করে মানঝহী থানের (গ্রামের পূজার বেদী) সামনে নিয়ে আসেন। সেখানে গ্রামের নারী-পুরুষ পারস্পরিক ডবঃহ্-জোহার (প্রণাম) করে। এ সময় জগ্‌মানঝহী সোহরায়ের সকল আনুষ্ঠানিকতার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং আগামী বছরের সোহরায় যেন নতুন আশা-আনন্দ নিয়ে ফিরে আসে সে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুশীলন

কাজ- ১ : সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সোহরায় উৎসবের বিভিন্ন পর্যায়ের নাম লেখ।

পাঠ- ০৮ : ওরাঁও নৃগোষ্ঠীর কারাম উৎসব

কারাম ওরাঁওদের সবচেয়ে বড় উৎসব। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সাধারণত এ উৎসব পালন করা হয়। কারাম উৎসব পালনের সঙ্গে ওরাঁওদের একটি কাহিনী জড়িত আছে। তাদের মতে, কারাম বৃক্ষ রক্ষাকর্তা। ইতিহাসের কোনো এক সময় ওরাঁও নৃগোষ্ঠী অন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে কারাম বৃক্ষের নিচে আশ্রয় নিয়েছিল। কারাম বৃক্ষ তাদেরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল। এ ঘটনাকে স্মরণ করার জন্য কারাম উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

চিত্র- ৬.৯ : কারাম উৎসব

এই উৎসব উপলক্ষে কারাম গাছের ডালপালা এনে সেগুলো ঘরের উঠানের মাঝ বরাবর পোঁতা হয়। তারপর কারাম গাছের সেসব ডালপালাকে ঘিরে পূজা-অর্চনা, নাচ-গান এবং কাহিনী ও পালাগান মঞ্চস্থ হয়। কারাম উৎসব চলাকালীন অবিবাহিত যুবক-যুবতীরা উপবাস করে থাকে। নব বিবাহিত বধূরা এ সময় শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসে। এ সময় তারা শ্বশুরবাড়ি থেকে ফলমূল, কাপড়সহ নতুন ডালিতে করে উপঢৌকন নিয়ে আসে। এজন্য কারাম উৎসবকে মিলন ও আনন্দের উৎসবও বলা হয়ে থাকে। এ উৎসবের মাধ্যমে বোনেরা ভাইদেরকে স্মরণ করে থাকে। ওরাঁওদের সমাজে একটি প্রবাদ চালু আছে। প্রবাদটি হলো– 'আপন কারাম ভাইকা ধারাম।' উৎসব শেষে কারামের ডালিগুলোকে জলাভূমিতে ডুবিয়ে দেয়া হয়।

অনুশীলন

কাজ- ১ : ওরাঁও জনগোষ্ঠীর কারাম উৎসবের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

পাঠ- ০৯ : মান্দি নৃগোষ্ঠীর ওয়ানগালা উৎসব

'ওয়ানগালা' মান্দিদের প্রধান সামাজিক ও কৃষি উৎসব। মান্দিদের বিশ্বাস ফসলের ভাল ফলনের জন্য দেবতাদের আশীর্বাদ প্রয়োজন। দেব-দেবীর আশীর্বাদ ও ফসলের প্রতি তাদের সুদৃষ্টি না থাকলে যেমন আশানুরূপ ফসল পাওয়া যায় না তেমনি মানুষের শারীরিক অবস্থাও সবসময় ভাল থাকে না। তাই ওয়ানগালা দেব-দেবীদের সুদৃষ্টি কামনা এবং তাদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য পালিত প্রধান উৎসব। মিসি সালজং উর্বরতার দেবতা, রক্ষিমেমো ফসলের জননী, সুসিমে শস্য রক্ষাকারী ও ঐশ্বর্যের দেবী। তাই জীবন ধারণের জন্য এসব দেব-দেবীর আশীর্বাদ প্রয়োজন। অক্টোবর মাসের শেষে অথবা নভেম্বর মাসে ওয়ানগালা উৎসব পালিত হয়।

চিত্র- ৬.১০ : ওয়ানগালা উৎসব

কোনো কোনো সময় এ উৎসব সপ্তাহকাল ধরে চলে। জুমখেতের সমস্ত ফসল তোলা হয়ে গেলে গারোরা গ্রামওয়ারী অথবা কোনো কোনো সময় কয়েকটি গ্রাম মিলে একসাথে এ উৎসব উদযাপন করে থাকে। শীতের আগমনের আগে মান্দি বর্ষ পঞ্জিকার সপ্তম (মতান্তরে দশম) মাস মেজাফাং (অক্টোবরের দ্বিতীয় থেকে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ) মাসে ওয়ানগালা উৎসব পালিত হয়ে থাকে। ওয়ানগালা শুরু ও শেষ করার সময় সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন বনের মেগং নামক পাহাড়ি ফুল ফুটতে শুরু করে তখনই ওয়ানগালা

চিত্র- ৬.১১ : ওয়ানগালা উৎসব

আয়োজনের সময় হয় এবং পূর্ণিমা চাঁদের আলো থাকতে থাকতেই ওয়ানগালা শেষ করতে হয়।' গ্রামে সকলের ফসল ঘরে তোলা হলে নকমা সকলকে ডেকে এনে ভোজে আপ্যায়ন করেন এবং ওয়ানগালার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তুতি শুরু করেন। ওয়ানগালা অনুষ্ঠান মূলত তিনটি পর্বে বিভক্ত। পর্বগুলো হলো– রুগালা, সা.সাৎ স.ওয়া এবং 'দামা গগাতা' বা 'জলওয়াৎতা' বা 'রুস্রতা'। রুগালা'র সারমর্ম হচ্ছে এই দিন রক্ষিমেমা ও রংদিক মিৎদিকে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে উপাসনা করা হয়। এরপর নকমার ঘরের মাঝখানে দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে রক্ষিত নতুন শস্য, শাক-সবজি, কৃষি সরঞ্জাম ও বাদ্যযন্ত্রগুলোর ওপর 'রুগালা' (অল্প পানীয় ঢেলে উৎসর্গ করা) করে দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে গ্রামের সবার বাড়িতে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। দ্বিতীয় দিন হয় 'সা.সাৎ স.ওয়া' (ধূপারতি উৎসর্গ)। মিসি সালজং-এর উদ্দেশ্যে এই নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়। তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান হলো 'দামা গগাতা' বা 'জলওয়াৎতা' বা 'রুস্রতা'। এই অনুষ্ঠান শেষে ওয়ানগালা উৎসবে ব্যবহৃত দামা, খ্রাম, কাল, রং প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রগুলো নকমার বাড়িতে এনে জমা দেওয়া হয়। তারপর নকমা সমবেত জনতার সামনে সালজং, মিৎদে ও রক্ষিমেমার উদ্দেশ্যে শেষবারের মতো মদিরা ও ধূপ উৎসর্গ করেন এবং প্রার্থনা শেষে তাদের বিদায় জানান। এর মধ্য দিয়েই ওয়ানগালা উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

অনুশীলন

কাজ- ১ :	মান্দি জনগোষ্ঠীর ওয়ানগালা উৎসবের বিভিন্ন পর্বের নাম লিপিবদ্ধ কর।
কাজ- ২ :	মান্দি সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন দেব-দেবীর নামের একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ- ১০ : খাসি নৃগোষ্ঠীর উৎসব - সাড সুক মেনসিম

সাড সুক মেনসিম হলো খাসি জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্যবাহী উৎসব। সাড-সুক-মেনসিম এর অর্থ হলো হৃদয়ের আনন্দ নৃত্য।

চিত্র- ৬.১২ : খাসি নৃগোষ্ঠীর 'সাড সুক মেনসিম' উৎসব

এটি মূলত নাচ পর্ব। ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ প্রদানের পর্ব হিসেবে এই উৎসব পালিত হয়। খাদ্যশস্যের অধিক ফলন, সম্পদ, সুস্বাস্থ্য এবং শান্তির জন্য ঈশ্বরের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই নাচের উৎসবটি পালন করা হয়। খাসি সমাজের পুরোহিত এ সময় ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনায় সাধারণ জনগণকে নেতৃত্ব দেন। মানুষের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ চেয়ে এই প্রার্থনা করা হয়। সাড-সুক-মেনসিম উৎসবের সময় নারী-পুরুষ উভয়েই বর্ণিল পোশাক পরে গভীর ভক্তি ও একাগ্রতার সাথে নাচতে থাকেন। এ সময় ঢোল (খাসি ভাষায় যার নাম 'কা-বম') এবং বাঁশি ও পাইপ (খাসি ভাষায় যাকে বলা হয় 'তাংমুড়ি') বাজানো হয় যা উৎসবের আমেজকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। প্রতি বছরের এপ্রিল মাসে এই উৎসব পালন করা হয়। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি ও উর্বরতার চিরন্তন রূপকে প্রতীকী অর্থে ফুটিয়ে তোলা হয়। নারীরা এখানে বীজ এবং ফসলের বাহক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। আর পুরুষেরা নেয় ফসল তোলার ভূমিকা। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসার প্রতিদানস্বরূপ নাচের এই উৎসবটি খাসিদের হৃদয়ে বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

ভারতের মেঘালয় রাজ্যে এই উৎসবটি সবচেয়ে ব্যাপক আকারে পালন করা হয়। ঐ রাজ্যে খাসিদের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তবে মেঘালয় ছাড়াও ভারত এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে খাসি জনগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে, সেখানেও সাড সুক মেনসিম উৎসব যুগ যুগ ধরে উদযাপিত হয়ে আসছে। কিন্তু বাংলাদেশে খাসি নৃগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষ খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করায় খ্রিস্ট-ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলোই এখন তাদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

অনুশীলন

কাজ- ২ :	খাসি নৃগোষ্ঠীর সাড সুক মেনসিম উৎসব পালনের উদ্দেশ্য কী? বাংলাদেশের বাইরে আর কোথায় এই উৎসবটি পালিত হয়?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. বৈসাবি উৎসবের জন্য নির্ধারিত দিন কোনটি ?

ক. চৈত্রের ২ দিন ও বৈশাখের ১ দিন　খ. চৈত্রের ১ দিন ও বৈশাখের ১ দিন
গ. চৈত্রের ৩ দিন ও বৈশাখের ২ দিন　ঘ. চৈত্রের ৪ দিন ও বৈশাখের ৩ দিন

২. ত্রিপুরাদের প্রধান সামাজিক উৎসব কোনটি?

ক. বিষু　খ. বৈসু　গ. সোহরাই　ঘ. সাংগ্রাই

৩. ওঁরাও নৃগোষ্ঠীর কারাম উৎসবের বৈশিষ্ট্য হলো–

i. সাধারণত শরৎকালে পালিত হয়
ii. অবিবাহিত নারী-পুরুষ খাবার বর্জন করবে
iii. নতুন কাপড়, ফলমূল উপহার আদান-প্রদান হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　খ. i ও iii　গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

শিল্পপতি রহমান সাহেব ঈদুল আযহার দিন ১টি গরু কোরবানি দেন। এভাবে পশু জবাইয়ের মাধ্যমে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উৎসবটি পালন করেন।

৪. রহমান সাহেবের উৎসবের সাথে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কোনো উৎসবের মিল রয়েছে?

ক. বিষু　খ. সাংগ্রাই　গ. বৈসু　ঘ. চিয়াসৎপয়

৫. এরূপ উৎসব পালনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা–

i. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখতে সচেষ্ট হয়
ii. নতুন বছরকে আহ্বান করতে প্রয়াস পায়
iii. দেবতাকে সন্তুষ্টি রাখতে চেষ্টা করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　খ. i ও iii　গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

২০২০

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.

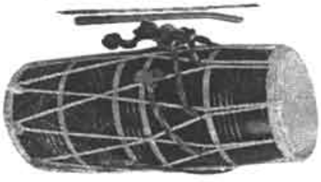

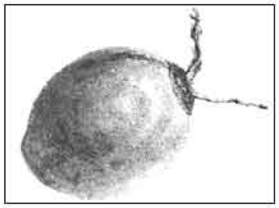

তথ্য ১ : চৈত্র মাসের ৩০ তারিখে উৎসবে ব্যবহৃত দ্রব্যের চিত্র

তথ্য ২ : চৈত্র ও বৈশাখ মাসে উৎসবে ব্যবহৃত দ্রব্যের চিত্র

ক. ম্রো নৃগোষ্ঠীর ভাষায় 'চিয়া' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. ম্রো ভাষায় 'রিয়াচাওয়া' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. তথ্য ১ এর মাধ্যমে পালিত উৎসবটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কী মনে কর তথ্য ২ এর মাধ্যমে শুধু ফুল বিজু উৎসব পালিত হয়? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২. মুশফিক যখন ছোট তখন তার বাবা রাঙ্গামাটি থেকে বদলি হয়ে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় ঈদের দিন নানা ধরনের মিষ্টিজাতীয় দ্রব্য, কোর্মা, পোলাও ইত্যাদি খাবার সময় রাঙ্গামাটির বন্ধু চীনুদের পিঠা, পায়েস, পাজন ও হরেক রকম তাজা ফলমূল খাবার কথা মনে পড়ে যায়। ঈদের দিন বন্ধুদের বাসায় বেড়াতে যাবার সময় তার রাঙ্গামাটির রাজবন বিহারে পূজা দেখার দৃশ্য মনে পড়ে। তার ছোট বোন রীমার অক্টোবর-নভেম্বরের ফসল ওঠার উৎসবটিই বেশি মনে পড়ে।

ক. ভারতের কোন রাজ্যে খাসিদের জনসংখ্যা সর্বাধিক? ১
খ. সা-সুক-মেনসিম উৎসবের মূল পর্বটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রীমার মনে পড়া উৎসব ও তার পর্বগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. মুশফিকের স্মৃতিতে শুধু রাখাইনদের উৎসবই গেঁথে আছে—বক্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

সমাপ্ত

২০২০

২০২০

শিক্ষাবর্ষ

৬ষ্ঠ-ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য